দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন : সেকাল-একাল
— পৃঃ ১৪

শ্রীরামজন্মভূমি ও বাঙালি সমাজ
— পৃঃ ১৯

৬৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ১০ এপ্রিল ২০১৭।। ২৭ চৈত্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১০ এপ্রিল - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

বাংলার সেকুলার সাংবাদিকরা সাম্প্রদায়িক হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : দুই 'কু' প্রভাবের কবলে দিদি : বাঁচতে ভরসা এ কোন দেবতা? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ঈর্ষার ব্যাধিতে পাগলদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে ▯ সুমিত্রা ঘোষ ▯ ১২

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন সেকাল-একাল ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৪

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ কোন পথে? ▯ ডা: শচীন্দ্রনাথ সিংহ ▯ ১৭

শ্রীরামজন্মভূমি ও বাঙালি সমাজ ▯ সুহাস মজুমদার ▯ ১৯

যোগী আদিত্যনাথের মুখোমুখি কি দাঁড়াতে পারবেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা? ▯ নলিন মেহতা ▯ ২৭

রামায়ণ এবং পুরুষোত্তম শ্রীরাম ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ৩১

সাক্ষাৎকার : সঙ্ঘের কাজ রাষ্ট্রবোধ নির্মাণ : মনমোহন বৈদ্য ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **চিঠিপত্র : ২৯-৩০** ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **অন্যরকম : ৩৭** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

ফ ঃ ১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ

১৯৪৬-এ দাঙ্গার পর বাঙালি হিন্দুর মনে যে আশংকা দেখা দিয়েছিল, সেই আশংকার বাস্তব পরিণতি ছিল দেশভাগ। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিও রাজ্যের হিন্দুর কাছে এক অশনিসংকেত। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। আগামী সংখ্যায় বিষয়টির উপর আলোকপাত করবেন **রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য বিশ্বাস, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, এষা দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, মোহিত রায়** প্রমুখ।

সেইসঙ্গে থাকছে রাজ্যে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া হিন্দুদের উপর নির্যাতনের সচিত্র বিবরণ।

দাম একই থাকছে : ১০ টাকা মাত্র

স্বস্তিকা

নববর্ষ সংখ্যার (১৪২৪) প্রকাশ অনুষ্ঠান
১৪ই এপ্রিল, ২০১৭, সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট
কেশব ভবন, ৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কল-৬

অনুষ্ঠানসূচী :—

- দীপ প্রজ্বলন
- স্বাগত ভাষণ
- নববর্ষ সংখ্যা প্রকাশ
- ‘স্বস্তিকা সম্মান’ প্রদান
- স্মারক বক্তৃতা
  বিষয় : জাতীয়তা ও সংবাদ মাধ্যম
- সভাপতির ভাষণ
- ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সুধী,

স্বস্তিকা-র নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৪ বঙ্গাব্দ'র প্রকাশ উপলক্ষে আগামী ১৪ই এপ্রিল ২০১৭, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী শেখর সেনগুপ্ত মহাশয়। ভবেন্দু ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রী রন্তিদেব সেনগুপ্ত মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার-এর প্রাক্তন অধিকর্তা ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে স্বস্তিকা সম্মান প্রদান করা হবে। আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কামনা করি।

নমস্কারান্তে—

রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক, স্বস্তিকা

বিজয় আঢ্য
সম্পাদক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকাকে যুক্ত এবং যাতায়াত আরও সহজ করিবার জন্য নির্মিত নয় কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথটি উদ্বোধন করিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপত্যকাবাসীদের উদ্দেশে 'টেররিজম' ও 'টুরিজম' অর্থাৎ সন্ত্রাস ও উন্নয়নের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে বলিয়া জানাইয়াছেন। গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদী বনাম সেনাবাহিনীর রক্তে স্নাত হইলেও, গত এক বৎসরে কাশ্মীরের যুবকরা যেভাবে জওয়ানদের বিরুদ্ধে মারমুখি হইয়া উঠিয়াছে, সেই দৃশ্য আগে সেইভাবে দেখা যায় নাই। এই পরিবর্তনের কারণ এইসব যুবকদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করিতেছে পাক মতদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সারমর্ম হইল, উন্নয়নই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ এবং এই সহজ সত্যটি যত শীঘ্র তাঁহারা বুঝিবেন ততই মঙ্গল। এই সমাধানের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কিছু নেতাও বাধা সৃষ্টি করিতেছে। পরিস্থিতি এমনই যে বিরোধী দলগুলিও সমস্যা সমাধানের পথে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। এই আবহে প্রধানমন্ত্রী যে পাথর ছুড়িবার পরিবর্তে পাথরকে বিকাশের কাজে লাগাইবার জন্য বার্তা দিয়াছেন তাহা খুবই প্রাসঙ্গিক। পাথর ছুড়িবার কারণে তাহাদের সময় ও সম্পদ দুই-ই ব্যয় হইতেছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রভাব উপত্যকাবাসীদের ওপর কতটা হইবে তাহা বলা কঠিন, কিন্তু যেভাবে তিনি পাক-অধিকৃত কাশ্মীরিদের বার্তা দিয়াছেন তাহার প্রভাব অবশ্যই লক্ষ্য করা যাইবে। কাশ্মীরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া যে লাভের লাভ কিছু হইবে না—পাকিস্তান ইহা বুঝিলে ভালোই হইবে। সন্ত্রাসকে মদত করিতে করিতে এখন পাকিস্তান নিজেই সন্ত্রাসে কবলিত। এত কিছুর পরও তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে বিনাশের দিকেই তাহারা ক্রমশ যাইতেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট যে কাশ্মীর উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতা ও সন্ত্রাসের সমর্থকদের কোনো ভাবেই বরদাস্ত করা হইবে না। বস্তুত এই সতর্কবার্তা আরও স্পষ্টভাবে বারবার জানাইলে ভালো হয়। কেননা কাশ্মীরের 'আজাদি'-র দাবিদাররা বুঝিতে পারিবে ভারত কখনই তাহাদের দাবির কাছে মাথা নত করিবে না। সন্ত্রাস বরদাস্ত করিবে না। বস্তুত এখন এমন একটা সময় উপস্থিত হইয়াছে যে বিচ্ছিন্নতার পথে চলিতে চলিতে সন্ত্রাস তাহাদের কাছে উৎসাহের পরিবর্তে বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ত্রাসবাদের সমর্থকদের এখন বিপথগামী হিসাবে চিহ্নিত করা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে সন্ত্রাস এখন পয়সা রোজগারের উপায় হইয়া উঠিয়াছে। এই ধান্ধা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। দেশের সেনাপ্রধান ও সুরক্ষাবাহিনীর শীর্ষ অধিকারী যখন উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়াছেন, তখন তাহাদেরকে বোঝাইবার চেষ্টার আর কোনো অর্থ হয় না। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকার রাজনৈতিক দলগুলিকেও স্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিতে হইবে যে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানের কোনো ভূমিকা নাই। পাকিস্তান যেভাবে কাশ্মীরের যে অংশটিকে নিজেদের বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে তাহা এখন চুরমার করিয়া দেওয়া দরকার। এমনভাবে চীনের প্রতিও কড়া মনোভাব লইবার প্রয়োজন যাহাতে চীন-পাকিস্তান করিডরের অজুহাতে তাহারা কোনো ভাবেই এই বিষয়ে নাক গলাইতে না পারে।

সুভাষিতম্

সর্বভূতস্থং আত্মানং সর্বভূতানি চ আত্মনি।
সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা।। (উপনিষদ)

যিনি সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করেন, তিনি পরমব্রহ্ম লাভ করেন। এই জ্ঞান ছাড়া ব্রহ্মদর্শনের অন্য কোনো উপায় নেই।

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে হিন্দু নিধনের প্রামাণ্য ইতিহাস লেখার দাবি : তথাগত রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১ এপ্রিল প্রয়াত চিকিৎসক ডাঃ সুজিত ধর ফাউন্ডেশনের তরফে 'নৈঃশব্দ্যের চক্রান্ত' নামে একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল দক্ষিণ কলকাতার 'একল ভবনে'। আলোচনার মূল বিষয় ছিল পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশে নানা ছুতোনাতায় নির্বিচারে হিন্দু নিধন, সম্পত্তি ধ্বংস ও লুটপাট সংক্রান্ত বিষয়ে এ বাংলার তথা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত ভুক্তভোগীদেরও এক দীর্ঘকালীন নীরবতা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঞ্চালক প্রবীণ সাংবাদিক অসীম কুমার মিত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘটিত গণহত্যার ইতিহাসের নিরিখে বাংলাদেশে দীর্ঘ ৭০ বছরের ক্রমিক হিন্দু হত্যা যে আদৌ লিপিবদ্ধ হয়নি সেই গুরুতর প্রসঙ্গের সূত্রপাত করেন। ত্রিপুরার মহামান্য রাজ্যপাল তথাগত রায় যিনি এই হিন্দু হত্যাকে ভারত তথা বিশ্ববাসীর নজরে তুলে ধরতে একটি প্রামাণ্য ইংরেজি গ্রন্থ (My people uprooted) ইতিপূর্বে রচনা করেছেন তিনিই

মঞ্চে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় ও অসীম কুমার মিত্র।

মুখ্যবক্তা হওয়ায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পায়। শ্রী রায় তাঁর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে হিন্দু নির্যাতনের নানান মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। বক্তব্যের একাংশে তিনি প্রয়াত আইসিএস অন্নদাশঙ্কর রায়ের নাম উল্লেখ করে বিধান রায়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ থেকে সংখ্যালঘু ফেরত পাঠানোয় তাঁর বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। অক্সফোর্ড ফেরত ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী যিনি 'বাঙালনামা' লিখে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন বা প্রথিতযশা লেখক পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা সুনীল গাঙ্গুলি যে তাঁদের জনপ্রিয় লেখাগুলিতে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ও বিতাড়ন নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি বা চুপ থেকেছেন তা নিয়ে তিনি গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর বাংলাদেশে একতরফা ভাবে আইন করে হিন্দুদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ারও তিনি নিন্দা করেন।

ইতিহাসের এই সংগুপ্তির ফলে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্ম যে সত্য ইতিহাস পাঠ থেকে বঞ্চিত হবে সে ক্ষোভও তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়। সভার শেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন উৎসুক বক্তাদের তিনি যে-কোনো আলাপ আলোচনায়, হাটে-বাজারে, সভায় সুযোগ পেলেই এ প্রসঙ্গে খোলাখুলি মত ব্যক্ত করা ও বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করার অনুরোধ করেন।

মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন ফাউন্ডেশনের পক্ষে প্রয়াত ড. ধরের সুযোগ্য জাতীয়তাবাদী সহধর্মিণী আগাগোড়া সর্বশেষ পঙক্তিতে বসে থাকা শ্রীমতী মহুয়া ধর।

স্বামী অসীমানন্দের কারামুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণে অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ হায়দরাবাদের চঞ্চলগুড়া সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। এতদিন আটক রাখা পূর্বতন সরকারের চক্রান্ত বলেই তিনি মনে করেন। স্বামী অসীমানন্দ (পূর্বাশ্রমের নাম নবকুমার সরকার) এবং আরেক অভিযুক্ত মোহনলাল রতেশ্বরের জামিন কিছুদিন আগেই মঞ্জুর করে মেট্রোপলিটন সেশন কোর্ট। বিচারপতিরা তাদের রায়ে বলেছেন, আদালতের সম্মতি ব্যতীত স্বামী অসীমানন্দ এখন হায়দরাবাদ থেকে কোথাও যেতে পারবেন না। ট্রায়ালেও তাঁকে হাজির থাকতে হবে।

ইভিএম নিয়ে আপ-কে কড়া জবাব নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গো-হারান হারার পর এই নয়া কেতাটি চালু করেন মায়াবতী। হারের দায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন অর্থাৎ ইভিএমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ এনে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করার এই প্রক্রিয়ায় সুরে সুর মিলিয়েছিল আরো দুই দল— অখিলেশের সমাজবাদী এবং পঞ্জাবে হেরে ভূত হওয়া অরবিন্দের দল। আর কেউ পাশে থাকুক না থাকুক, ভারতীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া বামপন্থীরা এদের পাশে ছিল। এবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি অর্থাৎ আপ-কে উপলক্ষ্য করে যোগ্য জবাব দিল নির্বাচন কমিশন।

গত ২ এপ্রিল আপ-কে পাঠানো পনেরো পাতার একটি চিঠিতে নির্বাচন কমিশন কড়া ভাষায় লিখেছে : 'আপের অন্তর্তদন্ত করে দেখা উচিত যে নির্বাচনে কেন তারা প্রত্যাশিত মানের ফল করতে পারেনি। কিন্তু এর জন্য ইভিএম মেশিনে কারসাজির অভিযোগ আনা অন্যায়।' আপের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে কমিশন জানিয়েছে যে আপ ইচ্ছে হলে পঞ্জাব হাইকোর্টে নির্বাচন পিটিশন ফাইল করলে এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র দেখাতে কমিশন প্রস্তুত। একই সঙ্গে আপের পক্ষ থেকে ইভিএমের ব্যবহার নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যকে যেভাবে বিকৃত করা হয়েছে তারও কড়া সমালোচনা করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বক্তব্য সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য বলে আপ যা প্রচার করছে সেটা তাদের ভুল ও কল্পিত ব্যাখ্যা। কমিশনের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টই শুধু নয়, বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টও ইভিএম ব্যবহারের পক্ষে বিভিন্ন সময় সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

কমিশনের এই কড়া চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই আপ তাদের প্রতিক্রিয়ায় একে রাজনৈতিক বক্তব্য বলে মনে করেছে। কমিশনের বক্তব্য যে নির্বাচন কমিশনের মতো একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সংস্থাকে শুধুমাত্র ভোটে হারার জন্য যেভাবে অনভিপ্রেত দোষারোপ করে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, তাকে প্রতিহত করতেই এই চিঠি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, কমিউনিস্ট-সহ জাত-পাতের রাজনীতি করা যে দলগুলি জাতীয়তাবাদের ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আর কোনোদিন প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাবার সম্ভাবনা নেই, তারা দুটো রাস্তা বেছে নিয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, হায়দরাবাদের মতো জায়গাগুলোতে কিছু দেশবিরোধী বুদ্ধিজীবীকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি জায়গায় ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ আনা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, এরা যে শুধু দেশবাসী নয়, দেশের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সে বোধ এই রাজনৈতিক প্রতারকদের নেই।

জম্মু-কাশ্মীরে ৭০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের বৃহত্তম সুড়ঙ্গ-পথ জাতিকে উৎসর্গ করার খুশি ব্যক্ত করেছেন সড়ক পরিবহণ এবং জাহাজমন্ত্রী নীতীন গড়করি। তিনি বলেন, আগামী দু'বছরে কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে জাতীয় সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে ৭০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। জম্মুকে কেন্দ্র করে একটি রিং রোড তৈরি করা হবে। খরচ হবে ২১০০ কোটি টাকা। ২২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুরূপ রাস্তা তৈরি হবে শ্রীনগরকে কেন্দ্র করেও। তিন মাসের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নীতীন গড়করি

নীতীন গড়করি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, লেহ্ ও লাদাখের মধ্যে ৬০০০ কোটি ব্যয়ে নির্মীয়মাণ জোজিলা সুড়ঙ্গপথের কাজ প্রায় শেষের দিকে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীরের ৭২টি প্রকল্পের জন্য ১,০১৯ টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেনানি এবং নাসরির মধ্যে নির্মিত দেশের বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথ সম্প্রতি জাতির সেবায় উৎসর্গ করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, এই সুড়ঙ্গপথ শুধু যে জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দেবে তাই নয়, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। পরোক্ষে যা রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধানে কাজে লাগবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সুড়ঙ্গপথ শুধু ভারতেই নয়, এশিয়ারও বৃহত্তম। ১২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত পথটি ২৮৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জম্মু ও শ্রীনগর জাতীয় সড়কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দুই লেনে বিভক্ত সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৯ কিলোমিটার।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা মন্ত্রকের দাবি জানাল ক্যাম্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের আর বেশি বাকি নেই। তার আগেই কলকাতায় আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর ঘটে চলা নির্মম অত্যাচার এখনই বন্ধ করার

CAAMB International Seminar in Kolkata (1st and 2nd April, 2017) on "Persecution on Religious Minorities in Bangladesh:Task Ahead".

জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সম্মেলনের আয়োজক 'ক্যামপেন এগেইনস্ট অ্যাট্রোসিটিজ অন মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশ' (সিএএএমবি)। সহযোগী আয়োজক, সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইন্দো-বাংলা রিলেশন।

অন্যতম অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ মাইনরিটি রাইটস অ্যালায়েন্স (কানাডা)-র প্রেসিডেন্ট অরুণ কুমার দত্ত বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা চরম দমন-পীড়নের সম্মুখীন। যার জন্য আমরা ভারত ও বাংলাদেশ সরকার এবং যাঁরা বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করছেন তাদের সকলের সাহায্যপ্রার্থী।'

গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'আমাদের প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকার সে দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমেদিয়া, নিরীশ্বরবাদী, প্রগতিশীল মুসলমান এবং অন্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন অবিলম্বে বন্ধ করুক। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।... সেইসঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য একটি আলাদা মন্ত্রক গঠন খুবই জরুরি। আমাদের প্রস্তাব, বাংলাদেশ সরকার যাতে মৌলবাদীদের তোষণ এবং সংখ্যালঘুদের নিধন এখনই বন্ধ করে তার জন্য ভারত সরকার কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করুক।' প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ থেকে পলাতক জঙ্গিদের নিরাপদ আবাস হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। সেটা উচিত নয়। আমাদের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের যারা প্রকাশ্যে রাজাকারদের বা নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের সাহায্য করছে তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কড়া ব্যবস্থা নিক।'

দু'দিন ধরে চলা সম্মেলনের প্রতিদিনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের অভিযোগের তির বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দিকে। বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্র ঘোষ বলেন, 'ওরা যেভাবে সম্মেলন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করছিল তাতে সত্যিই আমি ক্ষুব্ধ।' ক্যাম্পেন এগেইনস্ট অ্যাট্রাসিটিজ অন মাইনরিটিজ ইন বাংলাদেশের আহ্বায়ক মোহিত রায় অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই সম্মেলনের সঙ্গে বিজেপি বা সঙ্ঘের কোনো যোগাযোগ নেই।

মধ্যপ্রদেশে আড়াই হাজার মাদ্রাসায় আধুনিক পাঠক্রম চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুসলমান ছাত্রদের গুণগত মানে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য মাদ্রাসাগুলিতে দক্ষতা বৃদ্ধির পাঠক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মধ্যপ্রদেশের ২৫৩৫টি মাদ্রাসায় আধুনিক বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যাবে। মাদ্রাসার চিরাচরিত পাঠক্রম সবসময়েই নানা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সরকারের এই নতুন উদ্যোগও বিতর্ক তৈরি করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রকের অধীন ৭৪০১টি মাদ্রাসার মধ্যে ২৫৩৫টি প্রাথমিক ভাবে আধুনিক শিক্ষাক্রম চালু করার সম্মতি পেয়েছে। এর মধ্যে ১২৫৪টি মাদ্রাসায় মিলবে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১২৮১টিতে মাধ্যমিক শিক্ষা। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রস্তাব রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাব অনুমোদিত হলে টেলারিং, কম্পিউটার হার্ডওয়ার (অ্যাসেম্বলিং এবং মেইনটেনান্স), ফুড রিসোর্সেস এবং স্টেনোগ্রাফির (হিন্দি) মতো বিষয়গুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এখন মাদ্রাসাগুলিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া যায়। মধ্যপ্রদেশ মাদ্রাসা বোর্ড মাদ্রাসা-শিক্ষাকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া বোর্ড মাখনলাল ইউনিভার্সিটি অব জার্নালিজমের সহায়তায় উর্দু সাংবাদিকতা চালু করার কথাও ভাবছে। সুশিক্ষা প্রদান প্রকল্পের আওতায় ১৬৮৫টি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র সহায়তা প্রদান করে। এই প্রকল্পে প্রতিটি মাদ্রাসাকে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় কম্পিউটার ল্যাব তৈরি করার জন্য।

এছাড়া ৫০০০০ টাকা লাইব্রেরির জন্য এবং ১৫০০০ টাকা সায়েন্স কিট কেনার জন্য দেওয়া হয়।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত কয়েক বছরে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের যেসব মুসলমান ভারতে এসেছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধ ভাবে বসবাস করছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত প্রায় ৪০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলমান এখন ভারতে রয়েছেন। এরা মূলত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা। সমুদ্রপথে অথবা বাংলাদেশ এবং চীনের সীমান্ত পেরিয়ে এরা ভারতে প্রবেশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এখন প্রায় তিন লক্ষ রোহিঙ্গা বাস করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে শুধু জম্মু-কাশ্মীরেই সাড়ে পাঁচ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান বাস করেন। যদিও মন্ত্রকেরই কয়েকজন আধিকারিকের মতে সংখ্যাটা আরও বেশি। কমপক্ষে ১০ থেকে ১১ হাজার। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব রাজীব মহর্ষির নেতৃত্বে একটি বৈঠকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যসচিব, ডিজিপি, বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব-সহ সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

উবাচ

“হিন্দুরা গোরুকে মা হিসেবে দেখে। আমরা চাই হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে গোরুর মাংস বিক্রি বন্ধ হোক। হিন্দু ভাইদের কাছে অনুরোধ যতদিন না দাবি পূরণ হয় ততদিন আমাদের পাশে থাকুন।”

সৈয়দ জায়নুল আবেদিন আলি খান
খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি দরগার দিওয়ান

গোহত্যা এবং গোমাংস বিক্রি প্রসঙ্গে।

“কাশ্মীরের যুবকদের পাথর ছোড়ার পথ ছেড়ে সমৃদ্ধির পথে ফিরে আসার আন্তরিক অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই আবেদন যথার্থ রাষ্ট্রনায়কের মতো, যা মানুষকে দেশ গড়ার কাজে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করে।”

জিতেন্দ্র সিংহ
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী

কাশ্মীরে সুড়ঙ্গপথ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর আবেদন প্রসঙ্গে।

“যখন তিব্বতে থাকতাম মনে হতো বৌদ্ধ ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ভারতে এসে নানা ধর্মের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার পর এখন মনে হয় সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ। কারণ সব ধর্মই মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। এই ভাব-সম্মিলনই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।”

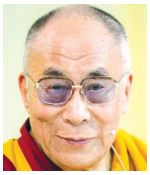

দলাই লামা
বৌদ্ধ ধর্মগুরু

নামামি ব্রহ্মপুত্র উৎসবে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে।

“সরকারি-বেসরকারি কোনো ক্ষেত্রেই মুসলমান মহিলাদের চাকরি করা উচিত নয়। পুরুষদের মতো বাইরে বেরিয়ে তাদের চাকরি করার কোনো প্রয়োজনও নেই।”

নাদিম আল ওয়াজাদি
উলেমা-এ-হিন্দের অধ্যক্ষ

মুসলমান মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গে।

বাংলার সেকুলার সাংবাদিকরা সাম্প্রদায়িক হিংসায় উস্কানি দিচ্ছেন

বলি, হচ্ছেটা কী? বাঙালি কলমজীবীরা একত্রে হৈহৈ করে ময়দানে নেমে পড়েছেন গোহত্যা বন্ধ করার প্রতিবাদে। গোহত্যা বন্ধ করলে ভারতের সেকুলার ইমেজটা বিশ্ব দরবারে ধুলায় লুটোবে। তাঁরা তারস্বরে চিৎকার করছেন, সস্তার গোমাংস না খেলে প্রোটিনের অভাবে তাঁদের গরিব মুসলমান ভাইয়েরা রুগ্ন হয়ে পড়বে। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্রাবাসের বাসিন্দাদের জন্য দৈনিক ৬০০ কিলো গোমাংস বা মোষের মাংস লাগে। উত্তরপ্রদেশের বেআইনি কসাইখানাগুলিকে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়ায় ছাত্রাবাসের বাসিন্দাদের দু'বেলা নিরামিষ আহার করতে হচ্ছে। এই ঘটনায় ছাত্ররা যতটা বিচলিত তার থেকে সহস্রগুণ ক্রুদ্ধ বাঙালি সেকুলারবাদী কলমবাজরা। তাঁরা এমন কথাও লিখছেন যে দেশের মুসলমানদের গোমাংস ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা সংবিধানের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার শামিল। দেশের নাগরিকদের খাদ্যাখাদ্য বিচার করার অধিকার রাজ্যকে দেয়নি সংবিধান। আসলে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে ২০১৯-এর লোকসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে। এই উদ্দেশ্যেই সাড়ম্বরে (চৈত্র) নবরাত্রির ব্রত পালন করা হচ্ছে। সংসদে ঘটা করে 'বিক্রম সম্বৎসর' পালন করা হচ্ছে। এ'সবই ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র করার ষড়যন্ত্র।

বাঙালি কলমবাজদের কলমের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে গুজরাট সরকারের একটি নির্দেশ। গুজরাটে গোহত্যা বেআইনি ছিল আগেই। শাস্তি ছিল সাত বছরের জেল। সেই শাস্তি বাড়িয়ে যাবজ্জীবন করে দেওয়া হলো। সেকুলার কলমবাজরা বলছেন, গুজরাটের আসন্ন বিধানসভা ভোটে হিন্দুত্ব বিজেপির বড় অস্ত্র হতে যাচ্ছে। তার প্রমাণ, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি বলেছেন, গোরু, গঙ্গা এবং গীতা হিন্দুদের এই তিন পবিত্র সম্পদ রক্ষা করতে বিজেপি দায়বদ্ধ। বুঝতে পারছি না গোসম্পদ রক্ষা করা, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করা এবং হিন্দুর পবিত্রতম গ্রন্থ গীতাকে বাঁচানো অপরাধ হবে কেন? এতে অ-হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হচ্ছে কীভাবে? কলমবাজ সৌমিত্র দস্তিদার বাংলা দৈনিক 'এই সময়' পত্রিকায় উত্তর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (৩০/৩) সোজাসুজি লিখেছেন, 'বিভিন্ন সামাজিক দ্বন্দ্ব জিইয়ে রাখাই বিজেপির এখন রণকৌশল। দেশের সর্বত্রই মোদী-শাহ জুটি ধর্মের তাস খেলছে। বিজেপির মূল চিন্তক

গূঢ় পুরুষের

কলম

আর এস এস তার জন্মলগ্নেই যে হিন্দু ভারতের কল্পনা করেছে আজ এতদিন বাদে তা বাস্তব হতে চলেছে।' সৌমিত্রবাবুর মতে, এই রাজনৈতিক মিলিট্যান্ট হিন্দুত্ববাদ জন্ম নিয়েছিল বহু আগে বীর সাভারকরের হাত ধরে। অবাক লাগে যখন দেখি বীর সাভারকরের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য দেশজননীর পায়ে আত্ম-বলিদানের ইতিহাস এইসব কলমবাজদের জানা নেই। এদের প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় এরা সুযোগ পেলে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকেও মুসলমান বিরোধী তকমা গায়ে লাগিয়ে দেবেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেও আনন্দমঠ উপন্যাস লেখার জন্য হিন্দু সাম্প্রদায়িক লেখক বলে কুৎসা করবেন।

বাঙালি কলমবাজ সাংবাদিকদের আপত্তিটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি নিয়ে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকার (২৯/৩) দিল্লির সংবাদদাতা প্রেমাংশু চৌধুরী বিরক্ত হয়েছেন সংসদ ভবনে ঘটা করে 'বিক্রম সম্বৎসর' পালন করার জন্য। এই উপলক্ষ্যে স্পিকার সুমিত্রা মহাজন সাংসদ এবং সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মধ্যাহ্নভোজনে। মেনু ছিল নিরামিষ। বিক্রম সম্বৎসর উদযাপন দেখে প্রেমাংশুবাবুর মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খেল, 'বিজেপি কি তবে সংসদেও হিন্দু সংস্কৃতি ঢুকিয়ে ফেলল?' প্রেমাংশুবাবু তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, 'সঙ্ঘ পরিবার হিন্দু নববর্ষকেই ভারতীয় নববর্ষ হিসেবে দেশজুড়ে উদযাপন করেছে।' প্রশ্ন তুলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দু নববর্ষকে দেশের নববর্ষ বলাটা কতখানি যুক্তিযুক্ত?

কলমবাজ সাংবাদিক গৌতম চক্রবর্তী জানতে পেরেছেন, 'যোগীরা পাঁঠার মাংস, শুয়োর, গোরু সবই খান (আ: বা: প: ১/৪)। গোরক্ষনাথের মোহান্ত আজ যদি কসাইখানা নিয়ে হইচই করেন, বুঝতে হবে তিনি শুধু বিজেপিতেই আছেন। স্বধর্মে নেই।' গৌতমবাবু ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছেন যোগীরা আসলে মুসলমান জোলা এবং হিন্দু অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের হাত ধরেই ভারতে গোরক্ষনাথের ধর্ম ছড়িয়ে ছিল। এই নাথ যোগীদের কাছে মরুতীর্থ হিংলাজে তীর্থযাত্রা করাটা পরম স্বপ্ন। কারণ, হিংলাজের যাত্রাপথে গুরু গোরক্ষনাথ তাঁর শিষ্য রাজা ভর্তৃহরির কান নিজে ফাটিয়ে দীক্ষা দিয়ে যোগী করেছিলেন। এরপরেই গৌতমবাবু যোগী আদিত্যনাথকে পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানে চলে যেতে। কারণ, যোগীদের তীর্থক্ষেত্র হিংলাজ তো পাকিস্তানে। আরেক কলমবাজ অমিতাভ গুপ্ত মশাইয়ের (আ: বা: ২/৪) প্রবল আপত্তি উত্তরপ্রদেশের বড় বড় শহরে অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড নামিয়ে দেওয়াতে। বলেছেন, বৃন্দাবনে রাধার সঙ্গে প্রেম আর গোপিনীদের সঙ্গে লীলা দেখলে গোকুলের ভদ্রলোকটিকেও ছেড়ে কথা বলত না অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড। লিখেছেন, 'হয়তো আরও কিছুদিন পরে জানা যাবে মাথায় ফেজ টুপি থাকলে, গালে বিশেষ রকমের দাড়ি থাকলে অন্য আরও কোনো এক স্কোয়াডের সদস্যরা এসে ভারতীয় সংস্কৃতির মাহাত্ম্য বুঝিয়ে যাবে।'

বাংলার সেকুলার সাংবাদিকদের কাছে এই সামান্য কলমচির আবেদন, দয়া করে সাম্প্রদায়িক হিংসার উস্কানি দেবেন না। দেশ কোন পথে চলবে তার দিশা দেখাবে দেশের মানুষ। দেশের ধর্ম, সংস্কৃতির বিরোধী কলমবাজরা নয়। ■

দুই 'কু' প্রভাবের কবলে দিদি বাঁচতে ভরসা এ কোন দেবতা?

মাননীয় মদন (মিত্র) দা,

আপনি তো মশাই পুরো সৌরভ গাঙ্গুলী! আপনাকে কাল্টিভেট করতেই হবে। একেই বলে 'কামব্যাক'। ক্রীড়া থেকে বিনোদন, রাজনীতি থেকে পেশাদার দুনিয়া— সর্বত্রই কামব্যাকের আশ্চর্য সব কাহিনি ছড়িয়ে। সৌরভ তো আছেনই, ভারতীয় উপমহাদেশে অমিতাভ বচ্চনের কামব্যাক সব থেকে বেশি আলোচিত। দেনায় নিমজ্জিত অমিতাভ সসম্মানে ফিরে এসেছিলেন বিনোদন দুনিয়ায়। এবং তার জন্য যশ চোপড়ার কাছে তিনি এখনও কৃতজ্ঞ। এখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি আপনি মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। তবে রাজনীতিতে কামব্যাকটি আপনি কার্যত ঘটিয়ে ফেলেছেন। অর্থাৎ বিরতির পরে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু দিদি কেন আপনাকে মেনে নিচ্ছেন! এটাই লাখ টাকার অবাক কাণ্ড। আসলে দিদি দুই কু প্রভাবে ভয় পাচ্ছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের নারদকাণ্ড নিয়ে সঙ্কটে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে দুই 'কু' প্রভাব। একজন 'কু'ণাল ঘোষ, অন্য জন 'কু'নওয়ারদীপ সিংহ। দলের এই দুই রাজ্যসভার সাংসদকে নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত শাসকদল। এক সময়ে তৃণমূলনেত্রীর কাছের দুই সাংসদই এখন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে দলকে এঁরা বিপদে ফেলতে পারেন বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একই ভয় কাজ করছে তৃণমূলের নেতাদের মধ্যেও।

কুণাল ঘোষ সারদাকাণ্ডে দীর্ঘ সময় জেল খেটে এসেছেন। দল তাঁর পাশে থাকেনি বলে অনেক ক্ষোভ কুণালের। ইতিমধ্যেই বই লিখে কিংবা সোশ্যাল সাইটে নিয়মিত পোস্ট করে সেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন তিনি। এ ছাড়াও ইদানীং বেশ কয়েক বার সিবিআই দপ্তরে গিয়েছেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি এমনও বলেছেন যে, সিবিআইকে তিনি আগের মতোই সাহায্য করছেন, আর সেটা কত বড় সাহায্য তা কিছুদিন পরে টের পাওয়া যাবে। এই 'বড়' সাহায্যটাই তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে 'বড়' বিপদ হয়ে আসবে না তো? প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। প্রশ্ন নয়, দিদির মনে রীতিমতো আতঙ্ক।

কুণাল নিজে সারদা, রোজভ্যালি-সহ বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার তদন্ত চলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য সিবিআইকে দিয়ে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমনকী কেডি সিংহ এবং তাঁর অ্যালকেমিস্ট সংস্থার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগাযোগ সম্পর্কেও অনেক 'অজানা' তথ্য তিনি গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দিতে পারেন। ইতিমধ্যেই তিনি 'সব জানেন' বলে ফেসবুকে পোস্ট করেছেন।

কুনওয়ারদীপ সিংহ বা কেডি সিংহের বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশই তদন্ত শুরু করেছে। নারদকাণ্ডে কেডির যোগাযোগ নিয়ে ইতিমধ্যেই সিবিআইকে জানিয়েছেন নারদকর্তা ম্যাথু স্যামুয়েল। তাই আগামী দিনে নারদকাণ্ড নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হলে কেডির ডাক পড়বেই। ক'দিন আগেই কেডির নিয়োগ নিয়ে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেডির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগই উঠেছে। এখনও কোনো কিছুরই জবাব দেননি কেডি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিলে তিনি মুখ খুলবেনই। আশঙ্কা তৃণমূলে। সিবিআই ডাকলে কেডি কী পদক্ষেপ করবেন তা নিয়েও চিন্তা রয়েছে।

সব মিলিয়ে কুণালের মতো কুনওয়ারদীপও তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বড় বিপদ। আর এই বিপদ আগামী এক মাসের মধ্যে ভয়ানক রূপ নিতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ, আর তিন সপ্তাহ পরেই নারদ তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। তার পরেই শুরু হয়ে যেতে পারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত। তাতে কার নাম উঠে আসবে দিদি জানেন। ওই ভিডিও দিদি বারবার দেখেছেন। সেটা আপনি ভালো জানেন মদনদা। আর দিদি মনে মনে যাঁরা তাঁর নামে 'কু' কথা বলেছেন তাঁদের উপরে রেগে আছেন। অনেককে তো দিদি উকিল ঠিক করতেও বলে রেখেছেন। আরও সবাই যখন জেলে যাবেন তখন জেল অভিজ্ঞ মদনই তো হয়ে উঠবেন দিদির বড় আশ্রয়। সুতরাং এখন আপনি আর শুধু দিদির মদন ভাই নন, মদন দেবতা। বাম হাতে হলেও পুজো দিতেই হবে। হবেই।

—**সুন্দর মৌলিক**

ঈর্ষার ব্যাধিতে পাগলদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে

সুমিত্রা ঘোষ

'চোরের মায়ের বড় গলা' এই প্রবাদবাক্যের যথার্থ প্রয়োগ অনেকেই নিশ্চয় জীবনে একবার না একবার প্রত্যক্ষ করেছেন। যে-কোনো কাজে নিজের দোষে হেরে গেলেই কেউ কেউ বড় বেশি কাতর হয়ে পড়ে। এদের অপরিণত মানসিক অবস্থা এত নীচুস্তরে থাকে যে এরা অন্য কারোও বিজয় সহ্য করতে পারে না। একবারও আত্ম-অনুসন্ধান করে দেখে না তার কোথায় ভুল-ত্রুটি আছে, কেন সে বিজয়ী হতে পারল না। এদের বিশ্বাস, বড় বাপের বেটা-বেটির পরিচয়পত্র হাতে থাকলেই বিনা দক্ষতায় জগৎজয়ী হওয়া যায়। কর্মযোগ, পরিশ্রম, সাধনালব্ধ দক্ষতা এসব গুণ একেবারেই মূল্যহীন। নিজের অক্ষমতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা এবং অপরিসীম অহঙ্কার এদের ক্রমাগত পতনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে না। যার ফলে স্বপ্নে দেখা 'বিজয়' বাস্তবে হাতের মুঠোয় আসে না। বার বার পরাজয়ের গ্লানি এদের ঈর্ষাকাতর দুর্বল চিত্তকে হিংসায় উন্মত্ত করে তোলে। এরা তখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলা 'বিজয়ী' ব্যক্তির প্রতি মারাত্মক রূপে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। কেউ তাঁকে 'মওত কা সওদাগর' বলে, কেউ 'কোমরে দড়ি বেঁধে' রাস্তায় ঘোরাতে চায়, কেউ সভাস্থলে-মঞ্চে তাঁর ফটো রেখে জুতো পেটা করে। সবটাই উন্মাদনার লক্ষণ।

এই রোগের জলজ্যান্ত উদাহরণ ১২০ বছরের পুরনো কংগ্রেস দলের বর্তমান সভাপতি রাহুল গান্ধী। এক সময় কংগ্রেস আর জনসঙ্ঘ দুটি রাজনৈতিক দলই জ্ঞানী-গুণী মানুষের সমাহারে গর্ব করে বলার মতো সমৃদ্ধ ছিল। জনসঙ্ঘ পরে ভারতীয় জনতা পার্টি হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। তাই অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানী, নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর মতো বিজ্ঞজনরা বিজেপির শিরোমণি হয়ে পার্টিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ওদিকে লালবাহাদুর শাস্ত্রী আর ইন্দিরা গান্ধীর পর স্ট্রং নেতৃত্ব তেমন দেখা যায়নি কংগ্রেসে। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর ইন্দিরা প্রায় গায়ের জোরে রাজীবকে রাজনীতিতে আনলেন ডাইন্যাস্টি রক্ষা করার জন্য। ইন্দিরা হত্যার পর রাজীবকে জোর করে সিংহাসনে বসানোর ফলে অনাগ্রহী রাজীব ঠেক্‌না দিয়ে কাজ চালাচ্ছিলেন বটে তবে বিদেশ নীতির কুটকচালী জ্ঞান ছিল না। তাই তৎকালীন শ্রীলঙ্কা প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনের সঙ্গে 'ইন্দো-শ্রীলঙ্কা পিস্ অ্যাক্ট' সই করে ফেলে অ্যান্টি এল. টি. টি.ই অপারেশনে সাহায্যের নিমিত্তে এক লক্ষ ইন্ডিয়ান পিস কীপিং ফোর্স (আইপিকেএফ) পাঠিয়ে দিলেন শ্রীলঙ্কার সিভিল ওয়ার লড়বার জন্য। সেটা ১৯৮৭ সাল। এই হঠকারিতা ৯১-এর ২১ মে কাল হলো। টেলিভিশনে রাজীব-হত্যার পূর্ণাঙ্গ ছবি যাঁরাই দেখেছেন কেউই সেই বেদনাতুর দৃশ্য ভুলতে পারবেন না। নিজের দেশের মাটিতে ছিন্নভিন্ন দেহটি দেখে পরম বিরোধীদের চোখও শুকনো থাকেনি। কংগ্রেসের কুণ্ডলীতে শনির সঙ্গে রাহু-কেতুও ঢুকে পড়ল। ভিপি সিংহ সংরক্ষণের ফাঁদে পতিত হলেন। মনমোহন সিংহ বিদেশি সোনিয়ার হাতের কাঠপুতুল সেজে বসে রইলেন। ২০১৪-য় বিজেপি বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলো। গোটা দেশের মানুষের পছন্দের মোদীজীকে কংগ্রেসের চোখের বালি বলে মনে হতে লাগল। রাহুলের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা সিংহাসনে চা-ওয়ালার ছেলে কেন বসবে? তাহলে তো ডাইন্যাস্টিই বাঁচবে না, ডেমোক্রেসির পত্তন লিটারেলি হয়ে যাবে। বুকের ভেতর ঈর্ষার আগুন নিয়ে বিদেশি মহিলা মোদীজীকে মুখ খুলে অশালীন ভাষায় গালাগাল করতে আরম্ভ করে দিল। মহিলা যে শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ পায়নি এটা প্রমাণ করে দিল নিজেই। ২০১৪ থেকে ২০১৭-র পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন অবধি এদের প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণের নমুনা দেখে বিরক্ত দেশবাসী সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মাতা-পুত্রের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে লাগল। বিদ্বেষের মাত্রা মানুষ উত্তরপ্রদেশের ভোটে প্রকাশ করেছে। এবার দেখা যাক এমন দুরারোগ্য মারণ ব্যাধির পেছনে ঈর্ষার কতগুলো ফ্যাক্টর কাজ করেছে।

> **সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, চিদাম্বরম, মণীশ তেওয়ারি, সুরজেওয়ালারা একজোট হয়ে বলতে লাগল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়নি! অবশেষে যখন পাকিস্তান নিজমুখে স্বীকার করল তখন এইসব দেশদ্রোহীদের মুখে চুনকালি পড়েছে।**

ঈর্ষা ১ : চা-ওয়ালার উচ্চশিক্ষিত মার্জিত পুত্র নরেন্দ্র মোদী স্বঘোষিত যুবরাজ দিল্লির স্টিফেন্স স্কুল থেকে স্কুল ড্রপ আউট রাহুল গান্ধীর স্বপ্নের সিংহাসন জনতার আদেশে অধিগ্রহণ করেছেন। সহ্য হয়নি মাতা-পুত্রের।

ঈর্ষা ২ : মোদীজীর শালপ্রাংশু দেহ, তাঁর ৫৬ ইঞ্চি ছাতি। নাতিদীর্ঘ দেহ, গালে টোলপড়া রাহুলের নিজেকে আয়নায় দেখতে ইচ্ছে করে না এখন।

ঈর্ষা ৩ : যোগ, প্রাণায়াম, ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে লব্ধ মোদীজীর অতুলনীয় প্রাণশক্তি, দৌড়ে একশ্বাসে সিঁড়ি চড়ে প্লেনে ওঠা, তাঁর পুরুষোচিত হাঁটা-চলা, গলার গম্ভীর স্বর, বাচনভঙ্গি, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই জিনিসগুলোর অভাব নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে রাহুল বার বার ৫৬ ইঞ্চি ছাতির খোটা দেয়।

ঈর্ষা ৪ : প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বন্ধুত্বের বার্তা বহন করে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে বিশ্বের প্রত্যেকটা দেশে যাওয়া, সর্বত্র সমাদরে আপ্যায়িত হয়ে এক Statesman Prime Minister-এর পরিচয়ে স্বীকৃত হওয়া, বিদেশের জমিতে বিদেশিদের মুখে 'মোদী... মোদী... মোদী' জয়ধ্বনিতে বন্দিত হওয়া। উফ্! হিংসার বিষেভরা প্রাণে কি সহ্য হয়? লোকটার এত সম্মান প্রাপ্তির কি প্রয়োজন ছিল? চা-ওয়ালার ছেলে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে ৪৫ মিনিট ধরে চমৎকার বক্তৃতা করতে কবে শিখল রে বাবা! মাথায় হাত দিয়ে ভাবে মাতা-পুত্র- কংগ্রেস। এমন অভূতপূর্ব অকল্পনীয় সংবর্ধনা স্বামী বিবেকানন্দ (ইনিও নরেন্দ্র) পেয়েছিলেন শিকাগোয়, তারপর তো আর কোনো ভারতীয় পাননি (এই ভাবনাটা পণ্ডিত কংগ্রেসী ক্রীতদাসদের মনে এসেছে)। দাসানুদাসরা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় মুখর হয়ে উঠতে দেরি করেনি। ঈর্ষার গতি বড় দ্রুত।

ঈর্ষা ৫ : ২০১৪-র ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করা প্রতিশ্রুতি একটার পর একটা পালন করে চলেছে এনডিএ সরকার। উপরন্তু যেগুলো ম্যানিফেস্টোতে ছিল না সেরকম কিছু কাজও করতে চলেছে। রাহুল, কংগ্রেস বিস্ময়ে হতভম্ব। প্রতিশ্রুতি তো ইলেকশনে জেতার জন্য দিতে হয় তাই দেওয়া। জিতে যাবার পর এগুলো কেউ মনে রাখে নাকি! আমরা তো রোটি-কাপড়া-মোকান দেবার প্রতিশ্রুতি হাজার বার দিয়ে আজাদির ৭০ বছরের মধ্যে প্রায় ষাট বছর রাজত্ব করলাম। মোদী এসে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই ফেলে দিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গেলে তো আমাদের পকেটে কানাকড়িও আসবে না। এইসব অপকর্ম করে মোদী যে আলি-কুলি, দলিত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ভোটব্যাঙ্কে থাবা মেরে দিল!

ঈর্ষা ৬ : ৪০ বছর ধরে Armed Force-এর ন্যায্য দাবি 'ওয়ান র‍্যাংক ওয়ান পেনশন' দেবো দেবো করে লটকে রেখে 'আঙুর ফল টক' খেলা খেলছিল কংগ্রেস দেশরক্ষী সৈনিকদের সঙ্গে। মোদীজী লম্বা হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় আঙ্গুরের থোকা পেড়ে সৈনিকদের হাতে তুলে দিলেন। নির্লজ্জরা বললো— বোকা নাকি! মাসে ১৩ হাজার কোটি ওদের দিয়ে আমরা লুটবো কী?

ঈর্ষা ৭ : আড়াই বছরের মধ্যেই মোদী সরকারের ১৫ লক্ষ প্রত্যন্ত গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও গ্যাস পৌঁছে দেওয়া। বিরোধীদের বেজায় গোঁসা।

ঈর্ষা ৮ : প্রত্যেক নির্ধন মানুষের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে জনধনযোজনা এনডিএ সরকারের গরিব দরদি মানসিকতার প্রশংসীয় প্রয়াস। সহ্য হয়!

ঈর্ষা ৯ : সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। আমাদের দুঃসাহসী বীর ছেলেরা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে মাত্র ৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ১৩টা সন্ত্রাসবাদী ট্রেনিং ক্যাম্প নিশ্চিহ্ন করে ১৫০-র বেশি টেররিস্ট এবং পাক আর্মি অফিসারকে নিধন করে পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছিল ঘরে। ইউ এস, ইউ কে, ফ্রান্স, এমনকী আরব আমির শাহির মতো মুসলমান দেশও এই দুঃসাহসিক অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে ধন্য ধন্য করেছে। আমাদের দেশের ভেতরে বাস করা দেশদ্রোহীরা পাকিস্তানের এমন হেনস্থায় শোকাতুর হয়ে ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর বীর জোয়ানদের ধিক্কার দিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কংগ্রেসের চিদাম্বরম, মণীশ তেওয়ারি, সুরজেওয়ালারা একজোট হয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তুলে বলতে লাগল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়নি নাকি! অবশেষে যখন পাকিস্তান নিজমুখে স্বীকার করল তখন এইসব দেশদ্রোহীদের মুখে চুনকালি পড়েছে।

ঈর্ষা ১০ : ডিমনিটাইজেশন দুঃসাহসিক মোদী সরকারের বাস্তবানুগ পদক্ষেপ। ৮ নভেম্বর ঠিক রাত ৮টায় ব্ল্যাকমানি হোল্ডার, কালোবাজারি, নকশাল, মাও, কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের ফান্ড জোগান দেওয়ার কাজে লিপ্ত দু'মুখো সাপ, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিকদের দিকে তাক করে মোদীজী একখানা পরমাণু বোমা ছুড়ে মারলেন একেবারে নিঃশব্দে। বোমা ফাটার পর হা-হুতাশ, প্রতিবাদ, কান্নাকাটির শব্দ শোনা গেল। আপামর সাধারণ মানুষ মোদীজীর এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে ৫০ দিনের জায়গায় আড়াই মাস ধরে হাসিমুখে অসুবিধা সহ্য করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ওদিকে প্রত্যেকটা চোর একে অন্যের হাত ধরে ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলে অকথ্য ভাষায় দেশহিতৈষী প্রধানমন্ত্রীকে গালাগাল, বদনাম, কুৎসা রটিয়ে কলঙ্কিত করার বৃথা চেষ্টায় ভেতরের 'ইতরামি' জনসমক্ষে প্রকাশ করে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনল। ওরা গরিবের রক্তমাখা টাকার পাহাড়গুলো সরিয়ে ফেলার সময় না পাওয়ায় রাগে অন্ধ হয়ে ভুলে গেল এই দেশটা ভারতবর্ষ। এই দেশে ৯০ শতাংশ মানুষ সততায় বিশ্বাসী। ১০ শতাংশ চোর-লুটেরা। এই ৯০ শতাংশ মানুষ ওইসব চোর নেতা-নেত্রীর মোদীজীর প্রতি কুৎসিত অপশব্দ ব্যবহার ক্ষমা করবে না। এই ক্ষমাহীনতার জলজ্যান্ত প্রমাণ ২০১৭-র পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। জাতি-ধর্ম-মজহব একসঙ্গে মোদীর পাশে, ঐতিহাসিক বিজয় ইউপি-তে। পঞ্জাবের বিজয় রাহুলের নয়, ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহের। লাস্ট ইলেকশনকে সম্মান দিয়েছে পঞ্জাব। বিজেপি মাথা ঘামায়নি। গোয়া-মণিপুরে কংগ্রেস নিজেই ঠাণ্ডা মাথায় নিজের পার্টিকে সাবোটাজ করে বিজেপিকে পথ করে দিয়েছে গুড গভর্নেন্সয়ের আশায়। অহঙ্কারী উদ্ধত রাহুল শুধু নিজের কফিনে নয়, অখিলেশের কফিনেও শেষ পেরেকটি ঠুকে লাগিয়ে দিয়েছে। ঈর্ষার ব্যাধিতে পাগলদের এভাবেই শোচনীয় পতন ঘটে। ■

শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন সেকাল একাল

সন্দীপ চক্রবর্তী

‘হাম আপকে লিয়ে আল্লাহ্ সে দুয়া মাঙেঙ্গে। লেকিন আপকো ভি এক ওয়াদা করনা পড়েগা। অগর আপ জিতে তো ইস রামজন্মস্থান পর এক মসজিদ বনাইয়েগা।’ উদ্ধৃতিটি এক ফকিরের। যাকে বলা হয়েছিল তার নাম বাবর। যদিও তিনি তখন হিন্দুস্থানের বাদশা নন। সুফির ছদ্মবেশে কাবুল থেকে ভাগ্যান্বেষণে অযোধ্যায় এসেছিলেন তৎকালীন হিন্দুস্থানের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করার অভিপ্রায়ে। তখনকার ফকির-দরবেশদের মধ্যে অনেকেই সলতানাতের হাঁড়ির খবর রাখত। শাহ জালাল এবং সৈয়দ মুসা আশিকান ছিলেন এইরকমই দুই ছদ্মবেশী ফকির। উপরের উদ্ধৃতিটি শাহ জালালের। বিশ শতকের গোড়ায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক হরিশ নারায়ণ এবং মৌলবি আবদুল গফ্ফরের লেখায় ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কথা রেখেছিলেন বাবর। ১৫২৬ সালে ইব্রাহিম লোদিকে পাণিপথের যুদ্ধে হারিয়ে হিন্দুস্থানের মসনদ দখল করার পর ১৫২৮ সালে সেনাপতি মির বাকিকে রামজন্মস্থানের সাবেক মন্দিরটি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে সেখানে একটি মসজিদ বানানোর হুকুম দিয়েছিলেন। মির বাকি মন্দির ভেঙে মসজিদের মতো দেখতে একটি ধাঁচা তৈরি করলেন। ধাঁচায় কস্টিপাথরে নির্মিত ১৪টি স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলিতে হিন্দুদের পবিত্র চিহ্নসমূহ উৎকীর্ণ। বোঝাই যায় মির বাকি ভাঙা মন্দিরের কিছু অংশ ধাঁচা তৈরিতে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু যা না হলে মসজিদ হয় না সেই মিনার এবং অজু করার জন্য জলের ব্যবস্থা ধাঁচায় ছিল না। বোধহয় সেই কারণেই কস্মিনকালে কোনো মুসলমান ধাঁচায় নমাজ পড়েনি। হিন্দুরাই সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালাত, শাঁখ বাজাত। মুঘল-ঔদ্ধত্যের স্মারক হয়েই রয়ে গিয়েছিল ধাঁচাটি। এবং সেইসঙ্গে হিন্দুদের জাতিগত পরিচয়ের সব থেকে বড়ো কলঙ্ক হয়েও।

বস্তুত প্রাচীন শ্রীরামমন্দির ভাঙার সময় থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রামজন্মভূমি আন্দোলন। ১৫২৮ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ৭৬ বার সংঘর্ষ হয়েছে। রক্ত ঝরিয়েও পূর্ণ সফলতা আসেনি ঠিকই কিন্তু তাই বলে হিন্দুসমাজ আশা ছাড়েনি। হিন্দুত্বের ধাত্রীভূমি রামজন্মস্থানকে ইসলামের দখলদারি থেকে মুক্ত করার জন্য একটার পর একটা যুদ্ধ হয়েছে। লক্ষাধিক ভক্ত ধন ও জীবন আহুতি দিয়েছেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর যা হয়েছিল তা এই ক্রমিক ইতিহাসের পরিণতি বলা যায়। ওইদিন মির বাকির অবৈধ ধাঁচা ধ্বংস করে হিন্দুসমাজ তাদের কলঙ্কমোচন করে।

রামজন্মভূমি আন্দোলনের ইতিহাস একেবারে শুরু থেকে পর্যালোচনা করলে এক আত্মপ্রত্যয়ী

রামমন্দির তৈরির জন্য পাথর কাটার কাজ নিরন্তর হয়ে চলেছে।

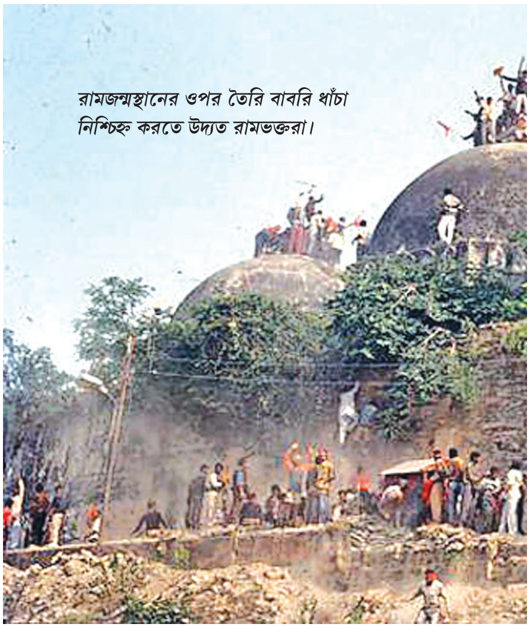

রামজন্মস্থানের ওপর তৈরি বাবরি ধাঁচা নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত রামভক্তরা।

জাতির কঠিন সঙ্কল্পের নানা দিক উঠে আসে। ১৫২৮ সালে শ্রীরাম মন্দিরের ওপর মির বাকির আক্রমণের সময় ১৪ দিন ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। ভাটি নরেশ মহতাব সিংহ, হংসবর নরেশ রণবিজয় সিংহ এবং তাঁর রাজগুরু দেবীদীন পাণ্ডের নেতৃত্বে হিন্দুসৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হয়। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি হলো ধাঁচা। ১৫২৮ থেকে ১৫৩০ এই কালপর্বে মোট চারবার যুদ্ধ হয়েছিল। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসনে বসলেন। ১৫৩০ থেকে ১৫৫৬ এই কালপর্বে দশবার যুদ্ধ হয়েছিল। রানি জয়রাজ কুমারী তাঁর মহিলা সৈন্য নিয়ে এবং স্বামী মহেশ্বরানন্দ সাধু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। গুরু মহেশ্বরানন্দকে হত্যা করেছিল মুঘল সৈন্যরা। ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫। আকবরের শাসনকাল। এই সময়ে কুড়িবার যুদ্ধ হয়েছিল। স্বামী বলরামাচার্য যুদ্ধে শহিদ হন। আকবর জানতেন তার মুসলমান উলেমারা বেশিরভাগই অযোগ্য। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে হিন্দুদের সাহায্য প্রয়োজন। রাজা বীরবল এবং তোডরমল্লও সম্ভবত তাকে সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই আকবর ধাঁচার সামনে চবুতরা নির্মাণ করে সেখানে একটি ছোট রামমন্দির তৈরি করে দেন। পুজোপাঠে কেউ যাতে বাধা না দেয় তাও নিশ্চিত করেন। কিন্তু তার অধস্তন তৃতীয় পুরুষের হাতে পড়ে সেই মন্দিরও টেকেনি। ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭।

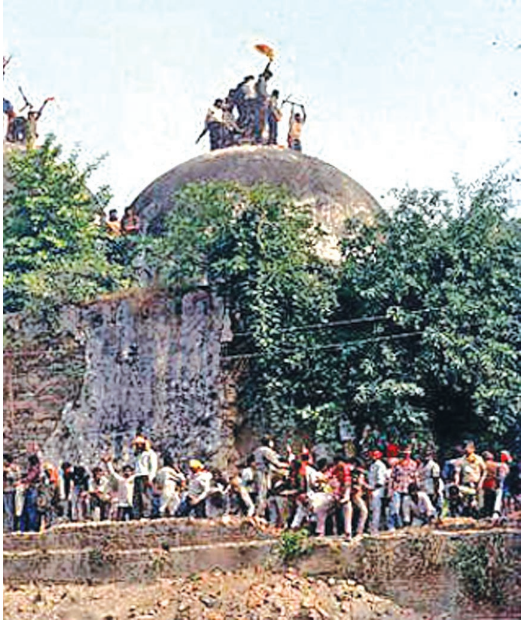

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। এই সময় তিরিশবার যুদ্ধ হয়েছিল। বাবা বৈষ্ণবদাস গোপাল সিংহ, ঠাকুর জগদম্বা সিংহ প্রমুখ যুদ্ধে নিহত হন। কিছুদিন পর গুরু গোবিন্দ সিংহ ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সসৈন্যে অযোধ্যায় আসেন। বাবা বৈষ্ণবদাস তার সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু তাঁরা পরাস্ত হন। ১৬৬৫ সালে ঔরঙ্গজেব অযোধ্যা দখল করে আকবরের তৈরি রামমন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দেয়।

রামজন্মভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য হিন্দুরা অযোধ্যার নবাবের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। ১৭৬৩ থেকে ১৮৩৬ —এই সময় অযোধ্যার সিংহাসন ছিল নবাব সওয়াদাত আলির দখলে। তার সঙ্গে হিন্দুদের মোট পাঁচবার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অমেঠির রাজা গুরুদত্ত সিংহ এবং পিপরার রাজকুমার সিংহ। ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৩ এই কালপর্বে অযোধ্যার নবাব ছিলেন ওয়াজেদ আলি শাহ। তার আমলেও চারবার যুদ্ধ হয়েছিল। বাবা উদ্ধবদাস এবং ভাটির রাজা যুদ্ধ করেছিলেন। রামজন্মভূমি উদ্ধারে দীর্ঘ সংঘর্ষের বিরতির জন্য নবাব তিন সদস্যের এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটিতে ছিলেন একজন হিন্দু, একজন মুসলমান এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন নিরপেক্ষ সদস্য। কমিটি তাদের রিপোর্টে লিখেছিল, 'মির বাকি কোনো এক হিন্দু মন্দির ভেঙে ওই ধাঁচা তৈরি করেছিল। কারণ এর ফলকে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, এটি ফরিস্তাদের (দেবদূতদের) অবতরণ ক্ষেত্র। ভবনের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছে।'

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার বাবরি ধাঁচা এবং হিন্দুদের পুজোর স্থলকে রেলিং দিয়ে ঘিরে দেয়। হিন্দুরা তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় করলেও মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ বেঁধেছে। তবে পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তই ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছে করেই ইন্ধন জোগাতে শুরু করে। কারণ ভারতের মানুষ মহাসংগ্রামের সময় বাহাদুর শাহ জাফরকে দেশের সম্রাট হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং জাফর আলি শ্রীরামজন্মভূমি হিন্দুদের হাতে সঁপে দেবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো সমঝোতা সূত্র তৈরি হলে তাতে ব্রিটিশের অসুবিধা। তাই উস্কানি। এখানেই শেষ নয়। মহাসংগ্রামে জয়ী হলো ব্রিটিশ। হিন্দু-মুসলমান একতা ভেঙে দেবার জন্য আমির আলি এবং বাবা রামচরণ দাসের ফাঁসি দিল ব্রিটিশ সরকার। ফৈজাবাদের দখলও চলে গেল তাদের হাতে। মন্দির-মসজিদ বিতর্ক আরও একটু উসকে দেওয়ার জন্য ধাঁচা তুলে দেওয়া হলো মুসলমানদের হাতে। কিন্তু চাকা আবার ঘুরে গেল ১৮৮৬ সালে। বিচারক চেমিয়র আদেশ দিলেন মন্দিরের জায়গায় মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এর আগে ১৮৮৫ সালে ফৈজাবাদের এক ব্যক্তি আদালতে আবেদন করেছিলেন (আপিল নং ২৭) অযোধ্যার পবিত্রস্থলে হিন্দুমন্দির ভেঙে মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং এই জায়গা হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। কিন্তু বিচারপতি ওই ঘটনা ৩৫৬ বছরের পুরনো বলে আবেদন খারিজ করে দেন।

১৯১২ থেকে ১৯৩৪ এই কালপর্বে রামজন্মভূমি উদ্ধারের জন্য হিন্দুরা অনেকবার যুদ্ধ করেছে। শেষে সন্তসমাজ এবং সাধারণ হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণে রামজন্মভূমি হিন্দুদের অধিকারে আসে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কূটনীতির ফলে সেই অধিকার বেশিদিন হিন্দুরা ভোগ করতে পারেননি। এরপর ১৯৪৯। ২২ ডিসেম্বর ধাঁচার ভেতর রামলালার মূর্তি পাওয়া গেল। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং ফৈজাবাদের কালেক্টর কে. কে. নায়ার। নায়ারসাহেব ধাঁচার সম্মুখভাগটি লোহার দরজা দিয়ে আটকে তাতে তালা লাগিয়ে দিলেন। একজন পুরোহিত নিযুক্ত হলেন বিগ্রহের পুজোর জন্য। এরপর থেকে শুধু পুরোহিত পুজোর জন্য তালা খুলে ভেতরে যেতেন, ভক্তরা বাইরে থেকে পুজো সারতেন। ১৯৮৪ সালে সাধারণের জন্য তালা খোলার সঙ্কল্প নিয়ে হিন্দু সন্তসমাজ দিল্লির বিজ্ঞানভবনে মিলিত হলেন। এই সভাকেই বলা হয় প্রথম ধর্মসংসদ। শ্রীরাম জানকী রথের প্রেরণায় হিন্দু সমাজ জেগে উঠল। ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ফৈজাবাদের জেলাশাসক এম. পাণ্ডে তালা খোলার নির্দেশ দিলেন। ১৯৮৯ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় স্বামী দেবরাহা বাবার উপস্থিতিতে গ্রামে-গ্রামে শিলাপুজো হলো। প্রায় তিন লক্ষ শিলা পূজিত হয়ে অযোধ্যায় এল। এর মধ্যে প্রবাসী ভারতীয়দের শিলাও ছিল। হাজারো বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বিহারের হরিজন সমাজের শ্রীকামেশ্বর চৌপাল মন্দিরের শিলান্যাস করলেন। ১৯৯০ সালের ২৪ মে হরিদ্বারে এক বিশাল সম্মেলনে সাধুসন্তরা ঘোষণা করলেন দেবোত্থান একাদশী

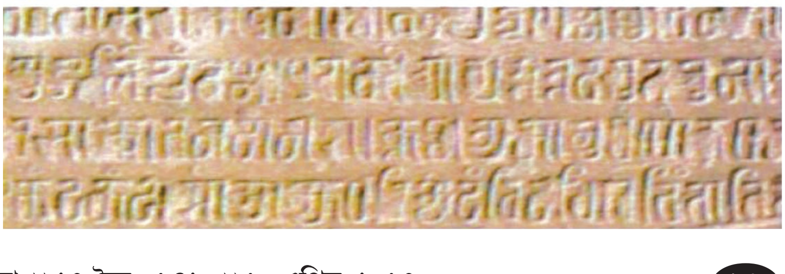

প্রত্নতত্ত্ব খননে প্রাপ্ত নিদর্শন।

(৩০ অক্টোবর ১৯৯০) থেকে করসেবা শুরু হবে। গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। ১৯৯০, ১ সেপ্টেম্বর তারিখে অরণি মন্থন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হলো যা রামজ্যোতি নামে বিখ্যাত হয়েছিল। দীপাবলীর আগেই লক্ষাধিক গ্রামে পৌঁছে গেল রামজ্যোতি। উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদব হুমকি দিয়েছিলেন, 'অযোধ্যায় একটা মাছিও গলতে দেব না।' কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তরা গম্বুজের মাথায় গৈরিক পতাকা উড়িয়ে দিলেন। শোধ নিল মুলায়ম সরকার। ২ নভেম্বর ১৯৯০ কলকাতার দুইভাই রামকুমার এবং শরদকুমার কোঠারীকে গুলি করে হত্যা করল মুলায়মের পুলিশ। আরও বহু রামভক্তকে হত্যা করে শব সরযূর জলে ফেলে দেওয়া হয়।

এরপর ১৯৯২। ৩০ অক্টোবর পঞ্চম ধর্মসংসদে সন্তেরা ঘোষণা করলেন গীতাজয়ন্তী থেকে আবার করসেবা শুরু করবেন। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষাধিক ভক্ত অযোধ্যায় পৌঁছে গেলেন। দীর্ঘকাল নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার মর্মঘাতী যন্ত্রণায় তারা ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছিলেন। সেই রোষানলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ধাঁচা। সেদিন ৬ ডিসেম্বর। ১৯৯২ সাল।

সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট আদালতের বাইরে দু'পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার পরামর্শ দিয়েছে। আলোচনা এর আগেও হয়েছে। কোনো ফল হয়নি। এবারও হিন্দু সংগঠনগুলি আলোচনা করতে রাজি কিন্তু বাবরি অ্যাকশন কমিটি আইনি সমাধান চায়। সম্ভবত সেটাই একমাত্র পথ। তাই অভিজ্ঞতা বলছে, রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। ঠিক যেভাবে সোমনাথ মন্দিরের বেলায় হয়েছিল। তখনকার প্রধানমন্ত্রী নেহরু চাননি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যোগে সংসদ বিল পাশ করেছিল। পরে সেই বিল আইনে রূপান্তরিত হয়। আর সেই আইনের জোরে তৈরি হয়েছিল সোমনাথ মন্দির। রামমন্দিরের ক্ষেত্রেও তাই চাই। এখন কেন্দ্রে এনডিএ সরকার। উত্তরপ্রদেশেও বিজেপি। রামজন্মভূমিতে সুরম্য রামমন্দির তৈরির এটাই সবচেয়ে ভালো সময়।

আইনি লড়াই এক নজরে

১৯৪৯ : কেন্দ্রের নির্দেশে ধাঁচায় তালা। জমি রিসিভারের হাতে।

১৯৫০ : রামলালার পুজোর জন্য আদালতে গোপাল সিংহ বিশারদের আবেদন। একই আবেদন পরমহংস রামচন্দ্র দাসের।

১৯৫০ : তালা খোলার জন্য আদালতে উমেশচন্দ্র পাণ্ডের আবেদন।

১৯৫৯ : নির্মোহী আখড়া জমি চেয়ে আদালতে।

১৯৬১ : উত্তরপ্রদেশে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের পাল্টা আবেদন।

১৯৬৪ : প্রত্যেকটি মামলা একত্রিত।

১৯৭১ : এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা। নতুন রিসিভার নিয়োগে বাধা।

১৯৮৪ : রামমন্দির আন্দোলন শুরু।

১৯৮৬ : ফৈজাবাদ জেলা আদালতের রায়ে খোলা হয় রামজন্মভূমির তালা। সেই সঙ্গে রামলালা দর্শনের অনুমতিও দেওয়া হয়।

১৯৮৬ : রায়ের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড এবং বাবরি অ্যাকশন কমিটি। সব মামলা হাইকোর্টের লক্ষ্নৌ বেঞ্চে।

১৯৮৯ : রামমন্দিরের শিলান্যাস।

১৯৮৯ : রামজন্মভূমি পরিসরের মালিক শ্রীরামলালা বিরাজমান। তাঁকে জমি ফেরত দেওয়ার আরজি পেশ আদালতে।

১৯৯১ : কল্যাণ সিংহ সরকারের ২.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ। বাবরি অ্যাকশন কমিটির বিরোধিতা।

১৯৯২ : বাবরি ধাঁচা ধ্বংস।

১৯৯৩ : কেন্দ্রীয় সরকারের ৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ।

১৯৯৪ : হাইকোর্টের রায় আসা পর্যন্ত স্থিতাবস্থা, বলল সুপ্রিম কোর্ট।

১৯৯৬ : লক্ষ্নৌ বেঞ্চে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু।

২০০৩ : আদালতের নির্দেশে ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের সমীক্ষায় মাটির নীচে হিন্দু স্থাপত্যের উল্লেখ।

২০০৫ : বিতর্কিত কাঠামোর কাছে জঙ্গি হামলা।

২০১০ : ১৭ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের রায় পিছিয়ে দেবার আরজি খারিজ।

২০১০ : ২২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা উমেশচন্দ্র ত্রিপাঠী।

২০১০ : ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে রায় পিছিয়ে দেবার আর্জি খারিজ হয়।

২০১০ : ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্নৌ বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায়।

২০১৬ : সুপ্রিম কোর্টে সুব্রহ্মণিয়াম স্বামীকে রামজন্মভূমি- সংক্রান্ত বকেয়া বিষয়গুলি দেখভালের নির্দেশ দিল। স্বামী প্রস্তাব দিলেন বিতর্কিত জমিতেই রামমন্দির হোক। মসজিদ তৈরি হোক সরযূর ওপারে।

২০১৭ : বিবদমান দুই পক্ষকে আদালতের বাইরে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ কোন পথে

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ সিংহ

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবীদের 'বন্দে মাতরম্' যেভাবে উজ্জীবিত করত ঠিক সেভাবে স্বাধীন ভারতে হিন্দু অস্মিতা রক্ষার জন্য 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি যেন সংগঠিত হিন্দুর হুঙ্কার। ত্রেতাযুগে রাম-রাবণের যুদ্ধের মতো কলিযুগেও স্বাধীন ভারতে রাম-রাবণের প্রাসঙ্গিকতা সমাপ্ত হয়নি। আজ বৈচারিক সংঘর্ষ চলছে। একদিকে ভারতের রাষ্ট্রীয়তার বর্তমান পর্যায়ে হিন্দুত্ব ও অপরদিকে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী সেকুলারবাদীরা। সারা পৃথিবীর ভারতভক্ত হিন্দুরা অযোধ্যায় শ্রীরাম-জন্মভূমিতে ভব্য মন্দিরের নির্মাণ চায়। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ কেবল মন্দির-মসজিদ বিবাদ নয়, হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নয়— রাষ্ট্রীয়তা বনাম অরাষ্ট্রীয়তার সংঘর্ষ। রাষ্ট্র অর্থাৎ কেবল ভূভাগ, জমির টুকরো নয় বরং ওই ভূমিতে জন্মগ্রহণকারী এক জনগোষ্ঠীর একাত্মতার ভাবনা। এই ভাবনাই ইতিহাস, পরম্পরা এবং সংস্কৃতির নির্মাতা।

বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে রামবিরোধীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ভারত গৈরিক যুগে প্রবেশ করেছে। শ্রীরাম জন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণ কেবল সময়ের অপেক্ষায়। যারা এক সময় হেয় করে তাচ্ছিল্যের স্বরে কয়েকটি রাজ্যকে 'গো-বলয়' বলে সম্বোধন করত আজ সেখানে যখন গোহত্যা বন্ধের জন্য সবেমাত্র কিছু পদক্ষেপ নেওয়া আরম্ভ হয়েছে তখন পশ্চিমবাংলায় সেকুলারবাদীদের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। প্রচলিত কথায় আছে 'বুরি নজরওয়ালে তেরে মুহ্ কালা'--- কু-মতলববাজদের মুখে ছাই। ২৫ কোটি জনসংখ্যার রাজ্যে ৪১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিপুল জয়ের পরও চেতনা হয়নি এদের। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেন জেহাদ? তিনি হিন্দুত্বের প্রতিভূ বলে— সন্ত বলে, না ৪৫ বছর বয়সে পাঁচবার সাংসদ বলে! যোগী আদিত্যনাথের গুরু স্বর্গত মহন্ত অবৈদ্যনাথ সাধুদের রাজনীতি করা প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন 'সাধুরা রাজনীতি করবেন না তো কি অসাধুরা রাজনীতি করবে?' মোদীর বিরোধিতা করতে হলে যোগীর করতে হবে--- তাই নয় কী? গত লোকসভা নির্বাচনে ৮০টি আসনের মধ্যে ৭৩টি আসনে যারা জয়লাভ করেছিল, তিন বছর পরেও বিধানসভায় তাদের জনসমর্থন কোনো ভাবে কমে যায়নি--- এই সত্যটা পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা মেনে নিতে কেন পারছেন না। হজ হাউসের পরিবর্তে কৈলাস-মানস সরোবরে যাত্রী-আবাস তৈরি হচ্ছে বলে কি গাত্রদাহ?

কিছুদিন আগে এক বিশেষ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট শ্রীরামমন্দির বিবাদ আলোচনার টেবিলে আলোচনার মাধ্যমে অবসান ঘটানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় সমঝোতার প্রয়াস রাজীব গান্ধী ও বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় হয়েছিল কিন্তু তা অসফল হয়। প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের কালখণ্ডে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা বয়কট করা হয়। তাই আবার এই বিষয়ে চর্চা করাই ভিত্তিহীন— সময়ের অপচয় মাত্র।

১৯৯২ সালে মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি প্রমাণিত হয় মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে তাহলে তারা স্বেচ্ছায় তাদের দাবি থেকে সরে এসে ওই স্থান হিন্দু সমাজকে দিয়ে দেবেন। এই কথার ভিত্তিতে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের ব্যবস্থাপনায় কানাডার ভূ-বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে মাটির নীচের ফটোগ্রাফি করানো হয় এবং পরে ২০০৩ সালে মাটি খোঁড়া হয়। ৬ মাসের এই খননকাজে ২৭টি বড় স্তম্ভ, ৫২ প্রকারের কারুকার্যযুক্ত পাথর, জলের ট্যাঙ্ক, সুন্দর সিঁড়ি, প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু কারুকার্যমণ্ডিত ছোট ছোট মন্দির পাওয়া যায়। যা বর্তমান সরকারি ব্যবস্থায় সুরক্ষিত রয়েছে। ২০১০ সালের এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চ রায় দেয় যে, অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানই শ্রীরামজন্মস্থান।

মোগল আমলে বিধর্মী বাবরের আক্রমণে অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দির ভাঙা

হয়েছে। হিন্দুদের মনোবল ভেঙে দিতে বিধর্মীদের প্রধান একটি উপায় ছিল তাঁদের উপাসনালয় ও দেববিগ্রহ ধ্বংস করা। গজনির সুলতান মামুদ বহুবার সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছিল। মুঘলযুগে হিন্দুদের প্রধান তিন আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবের প্রধান মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ তৈরি করে দেওয়া হয়।

এই মসজিদগুলি আজও দেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে চলেছে। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে রামমন্দির ভাঙা হয়েছিল। তখন থেকে শ্রীরামজন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণের জন্য হিন্দু সমাজ নিরন্তর সংঘর্ষ করে চলেছে। ৭৬ বার সংঘর্ষে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশি রামভক্ত প্রাণ দিয়েছেন। যতদিন ভব্য মন্দির তৈরি না হয় ততদিন হিন্দুসমাজ শান্তি পাবে না, কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। হিন্দু সমাজের এই সংকল্পকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

এ বছর উত্তর প্রদেশে নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যাপক সাফল্যের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ তাত্ত্বিক এম জি বৈদ্য নাগপুর থেকে বলেছিলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ করতে জনগণ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। গত প্রয়াগ কুম্ভমেলায় এক বিশাল সন্ত সম্মেলনে প্রয়াত অশোক সিংঘল বলেছিলেন, রামমন্দিরের বাধা দূর করার জন্য লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্রভাইয়ের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার আসুক এই আমাদের ইচ্ছা। তিন বছর-আগে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। গোরক্ষনাথ মন্দিরের মহন্ত যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে রাজ্যে সরকার গঠিত হয়েছে। হিন্দু সমাজের প্রত্যাশার পারদ ঊর্ধ্বগামী। সামনে কয়েক মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নতুন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হবেন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও আসন্ন। এই পরিস্থিতিতে রামমন্দির নির্মাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ বর্তমান কেন্দ্র সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাঁদের এই পবিত্র সংকল্পকে মূর্ত করে তুলুক— এই আশা। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, কোনো কাজের সফলতা তখনই আসে তার জন্য উপযুক্ত সময় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকলে। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের ধৈর্যচ্যুতি ও হাজার বছরের পরাধীনতার পর স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা এবং যেনতেন প্রকারেণ তা লাভ করার চেষ্টার ও মাসুল আজ ও আমাদের গুনতে হচ্ছে। এরই পরিণতি দেশবিভাগ।

শ্রীরামন্দির নির্মাণের বাধাগুলি দূর করার জন্য সমস্ত বিকল্প খতিয়ে দেখে ধারণা জন্মায় যেভাবে সংসদে আইন করে সোমনাথ মন্দির তৈরি করা হয়েছিল, সেই ভাবেই রামজন্মভূমিতে ভব্য মন্দির নির্মাণ করা হলে রাষ্ট্রভক্ত জনতার সংকল্প সফল করা সম্ভব হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবছর শ্রীরামনবমী ৫ এপ্রিল থেকে হনুমান জয়ন্তী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সারা দেশজুড়ে রামমোহৎসবের আয়োজন করেছে। সেই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম, শহর ও প্রখণ্ড কেন্দ্রে প্রায় ১২০০টি স্থানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা, ধর্মসভা, শোভাযাত্রা ও সহভোজের আয়োজন করেছে। বস্তুত রামনবমী উৎসব পশ্চিমবঙ্গে আজ এক সামাজিক উৎসব হয়ে উঠছে। ঠিক যেভাবে রাখিবন্ধন উৎসব হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আগামী প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের কাছে শ্রীরামমন্দির নির্মাণের আবশ্যকতা ও ইতিহাস তুলে ধরা। রামমন্দির নির্মাণে জনমত জাগরণ করাই হলো সময়ের আহ্বান।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

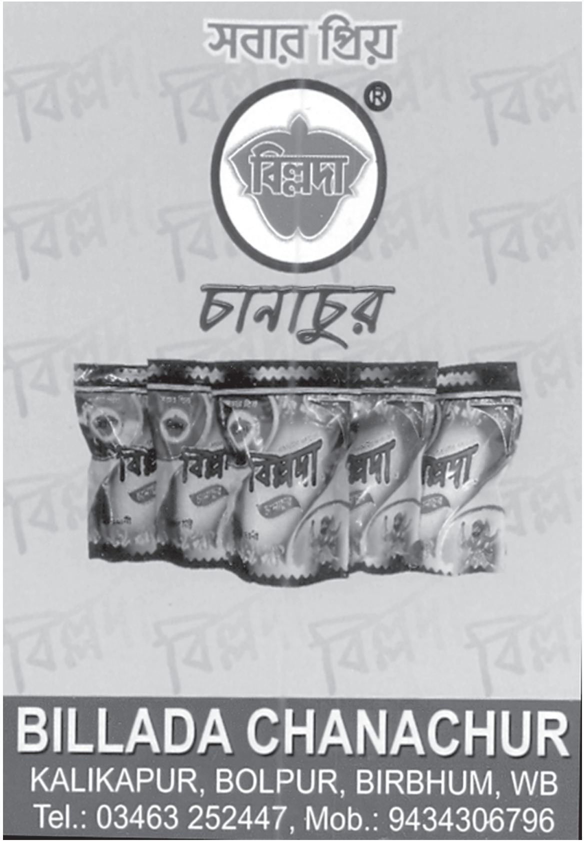

শ্রীরামজন্মভূমি ও বাঙালি সমাজ

সুহাস মজুমদার

রামজন্মভূমির আন্দোলন এবং ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে অযোধ্যা শহরে শ্রীরামমন্দিরের শিলান্যাস— এই দুই ঘটনা সম্বন্ধে দিল্লির প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জয় দুবাশী বলেন : দিনকতক আগে একজন নামজাদা ব্যবহারবেত্তা বলেছেন : অযোধ্যায় যেদিন সঙ্কল্পিত রাম-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন হবে সেদিন থেকে ভারতের ইতিহাস পাকাপাকিভাবে বদলে যাবে। তিনি খাঁটি কথা বলেছেন। রামজন্মভূমি আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত-ইতিহাসের ধারাবদল করা— nothing more nothing less।

ড. দুবাশী অযোধ্যা আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলেই ক্ষান্ত হননি; যে মনোবৃত্তি থেকে ওই আন্দোলনকে দেশের সর্বনাশ বলে ধিক্কার দেবার ঝোঁক এসেছে তার কথাও বলেছেন খুব স্পষ্ট করে। তিনি বলেন :

"For the first time in several centuries, the history of India is being made by Indians, call them Hindu, call them anything else, if the word Hindu stick in your gullet as it did in Nehru's."

এর থেকে বোঝা যায়, ড. দুবাশী অযোধ্যা আন্দোলনকে শুধু হিন্দুজাগরণ হিসাবেই অভিনন্দিত করতে চান না,— পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁর উত্তরসাধকরাই যে এই জাগরণের প্রধান প্রতিপক্ষ তাও বলতে চান স্পষ্ট ভাষায়। প্রশ্ন হচ্ছে : এই হিন্দুজাগরণ কি শুধু ভোটের রাজনীতিতে ওই সমস্ত প্রতিপক্ষের মোকাবিলাতেই নিঃশেষ হবে?

তা যে হবে না তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে : রামজন্মভূমি আন্দোলনই স্বাধীন ভারতে প্রথম হিন্দুর ইতিহাস চেতনাকে সত্যের ভূমিতে দাঁড় করানোর চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকেই জানেন, খিলাফতের যুগেই এদেশে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রথম একটা বড় চেষ্টা হয়, কিন্তু সে চেষ্টায় প্রথমেই বলি দেওয়া হয় দেশের ইতিহাস চেতনাকে। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ধর্মনৈতিক ভাবধারার মানুষ— বিরোধের ইতিহাসকে তিনি রক্ষণীয় ভাবতেন না। তাঁর দিক থেকে এই বিশ্বাসকে ভুল বলা যায় না, কেননা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কখনো বিরোধের স্মৃতির উপর দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ধর্মনৈতিক ভাবধারায় আপ্লুত মহাত্মা কখনো বোঝেননি, জাতীয় জীবনে এ নিয়ম খাটে না। মধ্যযুগের তুর্কি-হিন্দু বিরোধ মোটেই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ নয়—সেটা জাতির সঙ্গে জাতির বিরোধ এবং ধর্মের সঙ্গে ধর্মের বিরোধ। ওই বিরোধের পুরো ইতিহাস জানা না থাকলে ভাবীকালের মানুষের পক্ষেও তার অঙ্কুরোৎপাটন সম্ভব নয়। মহাত্মার পরম ব্যর্থতা এই যে, বিরোধের ইতিহাসের দিকে না তাকিয়ে তিনি কোলে টানতে চেয়েছিলেন এমন সমস্ত মুসলমান নেতাকে যাঁরা ওই মধ্যযুগীয় বিরোধের তুর্কি পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবেই বিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা মন্দির ধ্বংস ও প্রতিমা ধ্বংসের অভ্যাসকে ইসলাম থেকে নিবারণযোগ্য ভাবেননি; প্রতিমা পূজককে 'মুশরিক' নাম দিয়ে ঘৃণা করার রীতিকে বর্জনীয় ভাবেননি : বল প্রয়োগের দ্বারা ধর্মদীক্ষাদানকে নিন্দনীয় ভাবেননি; কাফের মেয়েদের 'ডান হাতে দখল করে' দাসীপত্নী

অযোধ্যায় রামলালার জন্মস্থানে বর্তমান ছাউনি।

বানানোর সঙ্কল্পকে বর্বরতা ভাবেননি। এই সমস্তই তুর্কি ইসলামের লক্ষণ। মহাত্মা এই ইসলামকেই আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন। এতদিন পরে বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, তিনি হিন্দু মুসলমান মিলনের কোনো পথ দেখাতে পারেননি, তাঁর আন্দোলনের নীট ফল হয়েছিল, সঙ্ঘাতের অতিবৃদ্ধি। পণ্ডিত নেহরু ঘুষ দিয়ে সেই সংঘাত নিবারণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারও ফল হয়েছিল উল্টো। রামজন্মভূমি আন্দোলন ঐতিহাসিক স্মৃতির যাথার্থ্যের দিকে তাকিয়েই ওই বিরোধের মূলোৎপাটন করতে চায়। হিন্দুকে সে মনে করিয়ে দিতে চায়, নিজের পবিত্রতম তীর্থস্থানের উপর বিধর্মীর ব্যভিচারকে যারা স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে চায় তারা হিন্দু হিসেবেও অধম, মানুষ হিসেবেও

অধম। মুসলমানকে সে মনে করিয়ে দিতে চায় : পূর্বপুরুষের দ্বারা কলুষিত বিধর্মীর তীর্থস্থানের উপর এ যুগেও যারা মৌরসিপাট্টার দাবিদার, তারা মুসলমান হিসেবে যত উত্তম বলেই দাবি করুক, মানুষ হিসাবে তারা অধমমানব। এদিক থেকে ড. দুবাশী রামজন্মভূমি আন্দোলনকে গান্ধী আন্দোলনের চেয়ে বড় জিনিস বলে অভিনন্দিত করেছেন।

এই ইতিহাস চেতনার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই রামজন্মভূমি আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝা যাবে। যাঁরা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধপক্ষ, পদ গৌরব এবং নামডাকের দিক দিয়ে তাঁরা অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের যা মূল উপাদান, অর্থাৎ নথিপত্রের তারিখচিহ্নিত সম্ভার, তার অনুসন্ধানে তাঁরা জন্মস্থানপন্থীদের তুলনায় চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বাবরি মসজিদের স্থানে রামমন্দির ছিল না' কিংবা '১৫২৮ সালের জায়গাটা ছিল ফাঁকা জায়গা'— এই সমস্ত দাবির সপক্ষে তাঁরা একটি নথিও দাখিল করতে পারেননি। উল্টোদিকে জন্মস্থানপন্থীরা তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে ১৯শ শতাব্দীর মুসলমান সাক্ষী আবিষ্কার করেছেন চারটি— যে সাক্ষীরা শত শত বছর যাবৎ রামজন্মস্থানের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে; অষ্টাদশ শতাব্দীর জেসুইট সাক্ষী আবিষ্কার করেছেন ১টি--- যে সাক্ষী ১৭৬০-৭০ সালেও মসজিদ/মন্দিরের ভিতর হিন্দুদের পূজা-আর্চার কথা লিখে গেছে; (পরবর্তীকালে তাঁরা মুসলমান সাক্ষ্য প্রমাণকে অষ্টাদশ শতকের শুরু পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। ঔরঙ্গজেবের নাতনির (বাহাদুর শাহের কন্যা) সাক্ষ্যও তাঁরা দাখিল করেছেন।) প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে একাদশ-দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন অনেক দূর পর্যন্ত; যদিও সে মন্দির রামের মন্দির কিনা তা তাঁরা চূড়ান্তভাবে দেখাতে পারেননি। তাঁরা জন্মস্থানেই ঐতিহ্য খুঁজে পেয়েছেন স্কন্দপুরাণ এবং আরো নানা প্রাচীন গ্রন্থে। পক্ষান্তরে বাবরিপন্থীরা জোর দিয়েছেন কতকগুলি পুঁথির নীরবতার উপর, — ঐতিহাসিক পদ্ধতি হিসেবে এর চেয়ে ফাঁকিবাজি আর হয় না। শুধু তাই নয়। নিজেরা কোনো নথিপত্র দাখিল না করে জন্মস্থানপন্থীদের নথিগুলির খুঁত বের করার চেষ্টাতেই তাঁরা কালহরণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণার সীমা-সরহদ্দের বোধ বিসর্জন দিয়ে মা-কৌশল্যার আঁতুড় ঘরের সাক্ষী প্রমাণ চেয়ে লোক হাসিয়েছেন। একথা বলব না যে চূড়ান্ত সাক্ষী প্রমাণ জন্মস্থানপন্থীরাই দাখিল করে দিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের স্বীকৃত পদ্ধতি যে তাঁরাই অনুসরণ করছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধপক্ষ যে শুধুই আগে থেকে তৈরি করা সিদ্ধান্তের সপক্ষে ছেঁদো যুক্তিতর্কের ভুরভুরি কাটছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এইজন্যই বলছিলাম : জন্মস্থান আন্দোলন হিন্দুর ইতিহাস চেতনার দিক দিয়েও দামি। ত্রেতাযুগের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে জল্পনা এবং বাবরকে 'সেকুলার এম্পারার' বানানোর প্রাণান্তকর চেষ্টাকে বলা যায় 'কাল্পনিকতা'। কিন্তু জন্মস্থানপন্থীরা যেভাবে রামের 'বার্থ সার্টিফিকেটের' তল্লাশ না করে মন্দির-ধ্বংসের তথ্য প্রমাণেই যত্নবান হয়েছেন— এইটেকে বলি 'ঐতিহাসিকতা'। এদিক থেকে দেখলে রামজন্মভূমির আন্দোলনে হিন্দু জাগরণের লক্ষ্য সুস্পষ্ট।

এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে : এই উপলক্ষে হিন্দুরা ইসলামের তত্ত্বচিন্তার দিকেও মনোযোগী হয়েছে। দিল্লির মনীষী রামস্বরূপ ও সীতারাম গোয়েল— বিশেষ করে প্রথম জন— কোরান হাদিসমূলক ইসলামের যে তথ্যপ্রমাণসিদ্ধ বিবরণ ইংরেজি-জানা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন, ইউরোপ হলে তা নিয়ে এতদিনে জয়জয়কার পড়ে যেত। রামস্বরূপ তাঁর Understanding Islam through Hadis গ্রন্থে 'সহী মুসলিম' নাম হাদিস সংগ্রহে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন : আদি যুগের ইসলাম ছিল লুটতরাজ, গুপ্তহত্যা এবং বিধর্মীর প্রতি নরঘাতক মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ; মন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস ছিল তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; এবং সে যে বিশ্বব্যাপী উম্মার (ইসলামি সমাজের) ঐক্যপ্রতিষ্ঠার কথা বলে তা আসলে বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং পারলৌকিক শাস্তির হুঙ্কার-সন্ত্রাসিত জেলখানার ঐক্য। রামস্বরূপ বলেননি, কিন্তু 'উম্মার'-ফাঁসে-আবদ্ধ সাধারণ মুসলমানের দারুণ বন্দিদশা যে-কোনো দেশেই কেবলমাত্র মুসলমানের চেষ্টাতে নিবারণ সম্ভব নয়, তাঁর বই পড়লে তা অতি সহজেই বোঝা যায়। তাঁর যুক্তি অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি, রামজন্মভূমি আন্দোলনের যারা বিরুদ্ধ পক্ষ তারা ভারতের মুসলমানের 'উম্মা' ঘটিত বন্দিদশা আরো বাড়াতে চায়— মনের বন্দিদশা তো বটেই। এদিক থেকে রামজন্মভূমি আন্দোলন মুসলমানের পক্ষেও একটা মুক্তির আহ্বান, যারা এর বিরুদ্ধ পক্ষ তারাই মুসলমানের পরমশত্রু। এই আন্দোলনের ফলাফলই প্রমাণ করতে পারে, — ভারতের মুসলমানরা আগামী দিনে আকবর-আবুল ফজল-দারার পন্থা অনুসরণ করে উদার ইসলামের পথে এগোবে না আরো কঠোরভাবে মোল্লা-ইসলামের জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে। অর্থাৎ রামজন্মভূমির আন্দোলন এক অর্থে মুসলমান জাগরণের চাবিকাঠি। তবে এও বলতে হবে, সেকুলার হিন্দু আর মোল্লা ইসলামের যোগসাজসের ফলে ওই জাগরণ অনেক বেশি দুঃসাধ্য, হিন্দু-জাগরণ সম্বন্ধে তা বলা যায় না।

রামজন্মভূমি আন্দোলনের আরেকটা মস্ত জিনিস এই যে, প্রস্তাবিত মন্দিরের প্রথম ইঁটটা একজন হরিজনকে দিয়েই গাঁথা হয়েছে,— এ কাজের গুরুত্ব ইতিহাস-চেতনার চেয়েও বেশি। নেহরুর ভারতে হরিজনদের দেখা হয়েছে মুসলমানের মতোই। ঘুষ খাইয়ে খাইয়ে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে হরিজনকে বানানো হয়েছে ভোটব্যাঙ্কের একটা মুসলমানেতর সংস্করণ। বলা বাহুল্য এটা মহাত্মার কর্মপদ্ধতির ঠিক বিপরীত। মহাত্মা হরিজনকে খাড়া করতে চেয়েছিলেন হিন্দুর ধর্মকর্মের স্তম্ভ হিসাবেই, 'হরিজন' শব্দটার মানেও তাই। এইজন্য তিনি প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন হরিজনের জন্য পূজামন্দিরের দরজা খুলে দিতে। রামজন্মভূমির আন্দোলন এক অর্থে মহাত্মার চেয়েও বড় কাজে হাত দিয়েছে। যে মন্দির হবে নবভারতের প্রতীকচিহ্ন তার প্রথম ইঁট

গাঁথার কাজে হরিজনকে আমন্ত্রণ করে সে স্বীকার করে নিয়েছে যে বর্তমান ভারতে হরিজনরাই যথার্থ জাতি-ব্রাহ্মণের মর্যাদা পাবার উপযুক্ত। হাজার হাজার বছরের বঞ্চনাই তাদেরকে সেই দুর্লভ গৌরবের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এই সঙ্কল্পের সিদ্ধি অত্যন্ত দুরূহ,— জাতি ব্রাহ্মণের শ্রেণীভুক্ত হরিজনের কাছে বেদবিদ্যার পথ খুলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পদে উন্নীত করাই এই আন্দোলনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে ব্রাহ্মণ-হরিজনের পংক্তি ভোজনে এবং হাতধরাধরিতে। বেদবিদ্যার আয়তনে হরিজন যেদিন ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় শামিল হবে, হিন্দুজাগরণ সম্পূর্ণ হবে সেই দিনই। সে লক্ষ্য আজ সুদূরবর্তী বটে, কিন্তু অযোধ্যার করসেবকরা প্রাণের মূল্যে তার সূচনা করে গেছেন। উদ্দেশ্যের উদারতা, ইতিহাসের সত্যজিজ্ঞাসা এবং মহৎ সঙ্কল্পের জন্য প্রাণদান— এগুলি যদি জাগরণের লক্ষণ না হয় তবে জাগরণ বলব কাকে?

॥ ২॥

বাঙালি হিসেবে আমাদের মস্ত লজ্জা এই যে, আমরা আজও রামজন্মভূমির আন্দোলনে উপযুক্ত মাত্রায় সাড়া দিইনি— অন্তত আমাদের বিদ্বজ্জন মণ্ডলী যে দেননি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর একটা কারণ বোধহয় : বাংলার তথাকথিত বিদ্বানরা তাঁদের বিদ্যা ও বিবেকবুদ্ধি বন্ধক রেখেছেন কতকগুলি কদর্যভাষী সংবাদপত্রের কাছে, —অযোধ্যার আন্দোলন সম্বন্ধে তাদের অশ্রদ্ধাপূর্ণ, অশালীন মতামতের বাইরে আর কোনো মতই আমরা এখানে প্রচার হতে দেখিনি। এই অশালীনতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে রামজন্মভূমির আন্দোলনকে বারবার 'গো-বলয়ের' আন্দোলন বলে বর্ণনা করা। পশ্চিমবাংলার খবরের কাগজে এই শব্দটার ছড়াছড়ি দেখে মনে হয় : বাঙালি সাংবাদিকের চোখে উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী মানুষগুলি সবাই গোরুর তুল্য এবং গোরুর চেয়ে উন্নততর জীবেরা শুধু কলকাতা ও তার উপকণ্ঠেই বাস করে। অবশ্য এরকম কথা বর্বরদের মুখেই মানায় এবং এই একটিমাত্র বাক্যের জন্যই বাঙালি

রামমন্দির আন্দোলনে শহিদ কলকাতার কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়— রামকুমার ও শরদ কোঠারী।

বলে পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। বাঙালি বিদ্বান্‌রা সাংবাদিকদের এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে কোনোদিন প্রতিবাদ করেননি, এর থেকে তাঁদের মতিগতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আসলে সাংবাদিকরাই এ যুগে শিক্ষিত বাঙালি মনের নিয়ন্ত্রক হয়েছে এবং এর মধ্যে বাঙালি মনের দারিদ্র্য প্রকাশ পেয়েছে বড় মর্মান্তিকভাবে। কৌলীন্যবন্ত মন আজকের পশ্চিমবাংলায় অত্যন্ত দুর্লভ হয়েছে বলেই রামজন্মভূমি আন্দোলনের বিরোধী মনোভাবটাও আমাদের মধ্যে এতটুকু উদার ভাষায় ব্যক্ত হতে পারেনি। কাগজওয়ালাদের অমার্জিত, অবিদগ্ধ এবং অতিউদ্ধত 'বদ্‌জোবানই' অযোধ্যা আন্দোলন সম্বন্ধে বাঙালি মনের অভিব্যক্তি হিসেবে প্রচার লাভ করেছে,— এর মধ্যে আমাদের গভীর লজ্জার কারণ আছে। মানসিক দারিদ্র্যের কথা যদি ছেড়েও দিই তবু এই একটানা বিষোদ্‌গারের মধ্যে আমাদের হৃদয়হীনতাও কিছু কম প্রকাশ পায়নি? কোঠারী ভাইয়েরা বাংলার করসেবক হিসেবেই উত্তরপ্রদেশের নরঘাতক পুলিশ বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দেন : আর কিছু না হোক, এর জন্য একটা সাধারণ ভদ্রতাসূচক শোকপ্রস্তাবও কি আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিনিধিরা গ্রহণ করতে পারতেন না? কোনো ভদ্র ও নামজাদা বাঙালি কি এটুকু বলার কষ্ট স্বীকার করতে পারতেন না যে 'কোঠারী ভাইদের করসেবায় যদিও আমাদের সমর্থন নেই তবু যে নরঘাতকের দল এই দুটি তরুণ ও তাজা প্রাণকে অকালে নষ্ট করেছে তাদের কাজকেও আমরা নিন্দা করি এবং এই দুটি অকালমৃত্যু তরুণের জন্য বেদনা বোধ করি।' আশ্চর্য এই যে, এটুকু কথাও পশ্চিমবাংলার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মুখ থেকে নির্গত হয়নি। বাঙালি মনের এত বেশি অধোগতি বোধ হয় বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কল্পনা করা যেত না।

এই অধোগতির সমর্থন যতই দুঃসাধ্য হোক, রামজন্মভূমি আন্দোলনের সমালোচনায় একটা কথা শিক্ষা ও সংস্কৃতি-অভিমানী বাঙালিরাই বলতে পারে। তারা বলতে পারে : ধর্মেকর্মে যারা বিশ্বাস হারিয়েছে তারা কেমন করে এইরকম একটা সাম্প্রদায়িক ধর্মের আন্দোলনে যোগ দেবে? একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির ধর্মবিশ্বাসই অত্যন্ত ক্ষীণ এবং সেই ক্ষীণতা তাদের শিক্ষা-দীক্ষারই ফল— তার পিছনে কোনো চক্রান্ত বা দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু ধর্মকর্ম সম্বন্ধে এরকম অনাস্থার যুক্তিতেও রামজন্মভূমি আন্দোলন সম্বন্ধে বাঙালির বিতৃষ্ণাকে যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। এই আন্দোলনের নেতারা বারবার বলেছেন, রামের নামে ভারতকে একীভূত করাই আমাদের উদ্দেশ্য, নতুন একটা রামানন্দী

সম্প্রদায় গড়া আমাদের মতলব নয়। এমনকী মুসলমানকেও তাঁরা রামের নামে অযোধ্যা-তীর্থযাত্রার ডাক দিতে বিরত হননি। একথা মানতেই হবে, মুসলমানরা এই ডাকে সাড়া দেয়নি। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি— এই ব্যর্থতার দায়দোষ কার? গত দু'তিন বছর ধরে এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় রামকে অসাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করতে মুসলমানের অনিচ্ছার চেয়ে বেশি অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে এক শ্রেণীর হিন্দু নেতার মধ্যেই। এমনকী রামের 'বার্থ সার্টিফিকেট' ছাড়া মন্দির মসজিদ তর্কের মীমাংসা হবে না'— এই আশ্চর্য আব্দারটাও বিশেষভাবে হিন্দুনামধারী গবেষকদের মুখে-মুখেই উচ্চারিত হয়ে বাবরি কমিটির নেতাদের মধ্যে পাচার হয়েছে। এর পিছনে যে রাজনৈতিক দলাদলির প্রেরণা আছে আমরা বাঙালিরা তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মোটেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিইনি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রামজন্মভূমির চেয়ে কোনো উদারতর আন্দোলন এদেশের মাটিতে আত্মপ্রকাশ করেনি, এমনকী নাস্তিকরাও এই আন্দোলনকে অনায়াসে সমর্থন করতে পারে। হরিজনকে যে আন্দোলন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠের মর্যাদা দিয়েছে তার সমাদরের জন্য বিশেষ কোনো ধর্মবিশ্বাসের দরকার হয় না, বরং এক্ষেত্রে ছুঁৎমার্গের পরিচয় দিয়েছে নাস্তিকরাই। যে আন্দোলন রামের মন্দিরকে সাম্প্রদায়িক মন্দির হিসেবে না দেখে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের মিলনভূমি হিসেবে দেখবার সুযোগ করে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে নাস্তিকের আপত্তিও মানা যায় না।

তার চেয়ে বড় কথা, রামমন্দির ঘটিত ইতিহাস-চেতনায় সাড়া দেবার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশি বাঙালিরই, কেননা আগ্রাসী ইসলামের দ্বারা রামমন্দির ধ্বংসের মধ্যযুগীয় ইতিবৃত্ত আজ বাঙালির রঙ্গমঞ্চেই পুনরাভিনীত হতে শুরু করেছে। জন্মস্থান আন্দোলনের শুরু থেকেই পূর্ববঙ্গ জুড়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা মামুদ গজনি বা আলাউদ্দিন খিলজির কীর্তিকেও লজ্জা দিতে পারে। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর অযোধ্যায় শিলান্যাস হয়। সেই শিলান্যাসের সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত অবশ্যই মসজিদের স্থানান্তর। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ওই স্থানান্তরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। তারা হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংসের কাজ শুরু করে ২৯ অক্টোবর থেকেই— অর্থাৎ কিনা শিলান্যাসের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। ২৯ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বরের মধ্যে কয়েকশো মন্দির তারা ধ্বংস করে ফেলে, লুটতরাজ করে ব্যাপকভাবে, কাফের নারীর ধর্মনাশ করে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক। তিনটিমাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করব।

(১) চট্টগ্রামের পাটিয়া থানার উনাইনগর গ্রামে ২৯ ও ৩১ অক্টোবরে বাস থামিয়ে হিন্দু আর বৌদ্ধ যাত্রীদের মারধোর করা হয় এবং (গ্রামের) বুদ্ধমন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে ফেলা হয়। বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের তাৎপর্য একটু বিশেষভাবে বিবেচ্য। ইতিহাস-পাঠক জানেন, আমাদের দেশে হিন্দু-বৌদ্ধর তাত্ত্বিক বিরোধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। একই রকম ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই দুই ধর্মের কার্যগত অবিরোধ। অযোধ্যার আন্দোলনকে অপদস্থ করবার জন্য ওই তাত্ত্বিক বিরোধ নিয়ে এদেশের অর্ধ শিক্ষিত সংবাদপত্রগুলি ইদানীং হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিষোদগার করেছে, এমনকী কেউ কেউ রামজন্মভূমিকে বৌদ্ধভূমি বলে রায় দিয়ে বুদ্ধভক্ত সাজার ভান করছে। সবচেয়ে রসের কথা, একজন মোল্লানেতা এই প্রসঙ্গে অযোধ্যার বৌদ্ধভূমির উপর হিন্দুর ঐতিহাসিক উপদ্রব নিয়ে বিলাপ করেছেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ভারতীয় মুসলমান নেতার এই বুদ্ধভক্তি থেকে লেশমাত্র অনুপ্রেরণা পায়নি। উনাইনগরে তারা রামাবতারেরও আগে শেষ করতে চেয়েছে বুদ্ধাবতারকে। এ ঘটনা বক্তিয়ার খিলজির কুকীর্তির স্মারক। বক্তিয়ার খিলজির কুকীতিটা ভারতে ইসলামি আক্রমণের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, সে হচ্ছে বক্তিয়ারের হাতে ওদন্তপুরী বিহারের ধ্বংস এবং ওই বিহারবাসী ভিক্ষুদের প্রাণসংহার। উনাইনগরের ইসলামি উপদ্রব ওদন্তপুরীর দূরাগত প্রতিধ্বনি।

(২) বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রম আক্রান্ত হয় ১৭ নভেম্বর। এই ঘটনার তাৎপর্যও গভীর। প্রত্যেকেই জানেন, রামকৃষ্ণ মিশনের আধুনিক সন্ন্যাসীরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের উদার ধর্মের স্বতন্ত্র গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে 'অহিন্দু' বলে আদালত থেকে একটা হুকুমনামা বার করেছেন। দুঃখের বিষয়, মিশনের এই অসাম্প্রদায়িক ঔদার্য পূর্ববঙ্গের মুসলমানের হাতে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির ধ্বংসকার্য নিবারণ করতে পারেনি।

(৩) ১৪ নভেম্বর লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি থানায় আক্রান্ত হয় ৩৬টি হিন্দুবাড়ি। লুটতরাজ হয় ব্যাপকভাবে, আগুন লাগানো হয় নির্বিচারে এবং হিন্দু মেয়েদের ধর্মনাশ করা হয় ঘরে ঘরে। ইসলামের গৌরব প্রতিষ্ঠার এই শেষ লক্ষণটা চলেছে সপ্তম শতাব্দী থেকেই। বিংশ শতাব্দীর ঘটনাকে 'পুনরাভিনয়' না বলে 'পুর্বানুবৃত্তি'

হিন্দু সমাজের নবজাগরণের দিক দিয়ে যাঁরা রামজন্মভূমি আন্দোলনের বৃহত্তর ও মহত্তর তাৎপর্যের পরিচয় পেতে চান তাঁদের অবশ্য পাঠ্য বই হচ্ছে বেলজিয়াম বিদ্বান কোয়েনরাড এল্স্ট-এর লেখা Ayodhya and After। এই বিদেশি বিদ্বান সমগ্র হিন্দু সমাজকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দেওয়া সাক্ষ্যের সামনে তথাকথিত নামজাদা ঐতিহাসিকদের— আর. এস. শর্মা, রমিলা থাপার, এস. গোপাল এবং ইরফান হাবিবের পশ্চাদপসরণের কাহিনি জানতে হলে নিম্নোক্ত বই দুটি পড়তে হবে।

১। History versus Casuistry

২। Evidence of Ramjanmabhoomi

Koenraad Elst এর বই Syodhya and After এবং History versus Casuistry. দিল্লির Voice of India থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

Voice India'র ঠিকানা : 2%18 Ansari Road
New Delhi, 11000
Evidence of Ramjanmabhoomi

বললেও চলে।

ঐতিহাসিক ইসলামের এই যে দন্তবিকাশকারী মূর্তি আজকের পূর্ববঙ্গে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে রামজন্মভূমির আন্দোলনেই। আগ্রাসী ইসলামকে ভালোভাবে জানবার জন্য এই মূর্তির দিকে তাকানো উচিত সমস্ত ভারতবাসীর কিন্তু বাঙালির কাছে এ ঘটনার গুরুত্ব আলাদা। বাঙালি হিন্দুকে যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তবে হিন্দু জাগরণ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। অযোধ্যার কর্মধারাকে উদারভাবে প্রসারিত করাই সেই হিন্দুজাগরণের উপায়। অবশ্য অযোধ্যার আন্দোলনকে বাঙালি যদি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণও করত, তার দ্বারা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের হিন্দুঘাতী উপদ্রব বন্ধ হোত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এও না বলে পারা যায় না, আমাদের অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্যকে আশ্রয় করেই ওখানকার উপদ্রবটা এত বাধাবিহীন হতে পেরেছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ইসলামের কালভৈরব মূর্তি আজ বাঙালি হিন্দুকে একেবারে গ্রাস করে ফেলার মতলবেই উদ্যমশীল হয়েছে। এ উদ্যম শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে কিনা সন্দেহ, কেননা আগ্রাসী ইসলাম আজ তার পশ্চিম এশীয় জন্মভূমিতেই দারুণ প্রহারে জর্জরিত—সপ্তম শতাব্দীর পুনরভিনয়ে তার আব্বাসী বা উমাইয়া গৌরবের দিন আর কখনো ফিরে আসবে বলে বোধ হয় না। গৌরব দূরে থাক, অদূর ভবিষ্যতে তাকে অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যই উদারমূর্তি গ্রহণে তৎপর হতে হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আগ্রাসী ইসলাম সম্বন্ধে এই সঙ্গত ভবিষ্যদ্‌বাণী আর যারই কাজে আসুক, বাঙালি হিন্দুর কোনো কাজে আসবে না। সে নিজে যদি আজও সতর্ক না হয় তবে ইসলামি কালভৈরব তার মূর্তি বদলের আগেই তাকে একেবারে উদারসাৎ করে বসবে বলেই আশঙ্কা হয়। এভাবে দেখলে বোঝা যায়, বাঙালি হিন্দুর পক্ষে হিন্দুজাগরণ নিয়ে শনৈঃ শনৈঃ ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগও অল্প— এ তার পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা বললেই চলে। অন্যের পক্ষে রামজন্মভূমি রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয় হয় হোক, কিন্তু বাঙালি হিন্দুর পক্ষে এটা জীবনরক্ষার শেষ আশ্রয়।

আজকের বাঙালির স্মরণ করা উচিত : হিন্দুজাগরণের আদি সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাতেই। ভূদেবের মতো রক্ষণশীল মনীষীও সেদিন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন : 'সত্যযুগে' সরস্বতী তীরে যে-সভ্যতার আলো জ্বলেছিল, 'কলিযুগে' সেই আলোকশিখা নতুন করে প্রজ্বলিত হবে ভাগীরথী তীরে। রাজনারায়ণ বসু সেই জাগরণের নবোদিত কিরণের দিকে তাকিয়ে হিন্দুজাতির পুনরুজ্জীবন প্রত্যাশা করেছিলেন মিল্টনের Areopagitca'-র উদ্দীপনাময় ভাষায়। দুঃখের বিষয়, স্বদেশি আন্দোলনের পর থেকে সেই জাগরণের ধারা রাজনীতির বালুকায় অন্তর্ধান করে দীর্ঘদিনের জন্য আত্মগোপন করেছিল। আজ যদি তা সরযূতীরে নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তবে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা আর যারই সাজুক বাঙালির সাজে না কোনোভাবেই। সেই জাগরণের স্রোতকে জ্ঞানের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে, তপস্যার দিক থেকে বরণ করে নেবার দায়িত্ব শুধু উত্তর ভারতীয় হিন্দুর নয়, সে দায়িত্ব আসমুদ্রহিমাচলব্যাপ্ত সমস্ত হিন্দুর এবং সেই সঙ্গে বাঙালি হিন্দুরও বটে। যে মুসলমান মন আজ পূর্বদিগন্ত ছেড়ে মক্কা-মদিনা বাগদাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে' তাকেও এই 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের' পথে ডেকে নেবার দরকার আছে। বলার দরকার আছে : "মানবধর্মের দিক থেকে তোমাদের ওই কাফেরদের ও মুশরিকবাদ অত্যন্ত গর্হিত এবং কাফেরবংশ ধ্বংস করে ভারতের মাটিতে ইসলামের নতুনতর জয়ধ্বজা রোপণের সঙ্কল্প একেবারেই আত্মঘাতী। ওপথে তোমাদের মুক্তি নেই, মুক্তি আছে 'মুশরিকবাদ' হীন উদার ইসলামের নতুনতর পথের অনুসন্ধানে, মুক্তি আছে হিন্দুজাগরণের সঙ্গে হাত মেলানোয়।" মুসলমানের কাছে একথা বলার দায়িত্ব বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দুর উপরেই ন্যস্ত আছে, কেননা আগ্রাসী ইসলামের বিশেষ লক্ষ্যস্থল আজকের দিনে সে-ই। হিন্দু যদি নিজের এই উদার অভ্যুদয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবে সে নিজেও বাঁচবে না, মুসলমানকেও নিযুক্ত করবে বিশ্ব-ইসলামের কাফেরঘাতী উন্মাদনার মারাত্মক বাহ্বাস্ফোটে।

"রামজন্মভূমি আন্দোলনের আরেকটা মস্ত জিনিস এই যে, প্রস্তাবিত মন্দিরের প্রথম ইঁটটা একজন হরিজনকে দিয়েই গাঁথা হয়েছে,— এ কাজের গুরুত্ব ইতিহাস- চেতনার চেয়েও বেশি। নেহরুর ভারতে হরিজনদের দেখা হয়েছে মুসলমানের মতোই। ঘুষ খাইয়ে খাইয়ে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে হরিজনকে বানানো হয়েছে ভোটব্যাঙ্কের একটা মুসলমানেতর সংস্করণ।"

(বর্তমানে লেখক প্রয়াত। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পক্ষে মনমোহন রায় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাটির পুনর্মুদ্রণ করা হলো)

এই সময়

যোগীর রাজধর্ম

যোগী আদিত্যনাথ সরকারের অবৈধ কসাইখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত সমর্থন করল অল ইন্ডিয়া মিট অ্যাসোসিয়েশন। তাদের অভিযোগ, মায়াবতী এবং অখিলেশ সরকার মাংস বিক্রেতাদের সঙ্গে অন্যায় করেছে। যোগী আদিত্যনাথ যা করেছেন সেটা তার রাজধর্ম।

সুষমাকে তিনকন্যা

একজনের স্বামী মার্কিন নাগরিক। বিয়ের পর থেকে নিপাত্তা। দ্বিতীয়জন একটি আন্তর্জাতিক

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মেক্সিকোয় যেতে চান। আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। তৃতীয়জনের স্বামী নিউজিল্যান্ডে থাকেন। ভিসা-সমস্যায় স্বামীর কাছে যেতে পারছেন না। তিনজনেরই মুশকিল আসান সুষমা স্বরাজ। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সুষমা।

স্থূল রসিকতা

মোটা মানুষদের নিয়ে রসিকতা করতে পছন্দ করেন নিকোলে আরবার। কিন্তু যাদের নিয়ে

রসিকতা তারা পছন্দ করেন না। অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে বিরক্ত হয়ে ইউটিউব নিকোলের সব ভিডিয়ো পোস্ট সরিয়ে দিয়েছে। নিকোলে অবশ্য তাতে দমে যেতে রাজি নন।

মেদিনীপুরে ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে আলোচনা সভা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে গত ২৬ মার্চ মেদিনীপুর নগর স্থিত বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতার জন্মসার্ধশতবর্ষে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. সুকুমার ভুঁইয়া। মুখ্য বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক

রন্তিদেব সেনগুপ্ত। তিনি ভগিনী নিবেদিতার কর্মপ্রয়াস, আত্মত্যাগ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেন। আলোচনাসভায় সহস্রাধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। হলের বাইরেও জায়ান্ট স্ক্রীনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেদিনীপুর জেলা সম্পর্ক প্রমুখ নীলমণি দে এবং মেদিনীপুর মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সঞ্চিতা কবি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ বীরেন পাল, প্রান্ত-সহ সম্পর্ক প্রমুখ সুনীল ঘোষ, মেদিনীপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুঁইয়া, জেলা সঙ্ঘচালক ঠাকুরদাস অধিকারী, বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী, মেদিনীপুর জেলা কার্যবাহ মৃণালকান্তি খাঁন-সহ বহু কার্যকর্তা।

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কার্যকর্তা সম্মেলন

গত ২৪ ও ২৫ মার্চ স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ দক্ষিণবঙ্গের কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কলকাতা কার্যালয় নরেশ ভবনে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কাশ্মীরিলালজী এবং অখিল ভারতীয় সহ- বিচারবিভাগ প্রমুখ সুশীল কুমারজী। চীনা অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা অভিযান ছিল এই শিবিরের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ৩০ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক সুব্রত মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেন পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত সংযোজক প্রণয় রায়।

এই সময়

গো-হত্যায় যাবজ্জীবন

গুজরাটে গো-হত্যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সম্প্রতি বিধানসভায় গুজরাট

অ্যানিম্যাল প্রিভেনশন অ্যাক্ট ১৯৫৪ আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। নতুন আইনে গো-হত্যাকারী এবং মাংসবিক্রেতা উভয়েই শাস্তিযোগ্য।

তিন ঠাম্মার কীর্তি

নিরু গান্ধী, মণিকা চানানা এবং সরিতা মনোচা

মোটেই সাধারণ ঠাম্মাদের মতো নন। যে বয়েসে মহিলারা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলে আর সিরিয়াল দেখে সময় কাটিয়ে দেন, সেই বয়েসে তাঁরা নিজেরা ড্রাইভ করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন। সম্প্রতি গিয়েছিলেন দিল্লি থেকে রামেশ্বরম। কোনো পুরুষ ছাড়াই।

চুলে কোপ

যে কোনো ধরনের স্পাইকি হেয়ারকাটে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইরান সরকার। নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে ট্যাটুকেও। সরকারের যুক্তি, এই ধরনের ফ্যাশন শয়তানের উপাসনার সমার্থক। তাই ইরানে স্পাইকি নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

রায়গঞ্জে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

গত ২৬ মার্চ অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম উত্তরবঙ্গ পরিচালিত মাতঙ্গিনী কন্যা ছাত্রীবাসের বার্ষিক উৎসব রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর সারদা শিশুতীর্থ পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিগত ২৪ বছর যাবৎ দরিদ্র বনবাসী ও জনজাতি ছাত্রীদের জন্য এই ছাত্রী নিবাস চলছে। বর্তমানে ছাত্রীনিবাসের ২৭ জন ছাত্রী পঞ্চমশ্রেণী থেকে তদূর্দ্ধ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। এদের থাকা-খাওয়া ও টিউশন নিঃশুল্ক। একথা জানালেন প্রদেশের ছাত্রাবাস প্রমুখ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দুপুরে মঞ্চে ভারতমাতা ও শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন কল্যাণ আশ্রমের উত্তরবঙ্গ রাজ্য সহ-সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক লক্ষ্মীরাম টুডু। পরে বিশিষ্ট অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মঞ্চে উপবিষ্ট জনজাতি সমাজের মধ্য থেকেই তাঁদের ধর্ম-সংস্কৃতি ভূমি রক্ষায়

নিয়োজিত দুই সমাজসেবী যোগেন পাহান ও সরকার টুডুকে অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আশ্রমের ছাত্রীদের কণ্ঠে সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। যোগাসন, সূর্যনমস্কার ও গোপুরম ছিল দৃষ্টিনন্দন। সবশেষে বনবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতা। রায়গঞ্জ ও আশপাশের জনজাতি গ্রাম থেকে ১৮টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দলকে কাপ/ট্রফি প্রদান করা হয়। এছাড়া চিত্রশিল্পী ও চিত্রনির্মাতা তথা বঙ্গশ্রী সম্মানপ্রাপক তপন সাহাকেও কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সম্মানিত করা হয় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিপ্লব ঘোষকে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কল্যাণ আশ্রমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক গৌরহরি চক্রবর্তী। সাঁওতালী ভাষায় কল্যাণ আশ্রমের ঐতিহাসিক ও সামাজিক ভূমিকা উপস্থাপন করেন রাজ্য সহ-সভাপতি লক্ষ্মীরাম টুডু। এছাড়া জনজাতি হিতরক্ষার বিষয়ে বলেন দেবাশিস ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী ভবানী সেন। ধন্যবাদ জানান জেলা সভাপতি পৃথ্বীশচন্দ্র পাল। প্রায় এক হাজারের বেশি জনজাতি ও নগরবাসীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কল্যাণ আশ্রমের শ্রদ্ধাজাগরণ প্রমুখ ডাঃ অশোক জানা ও রাজ্য সংগঠন সম্পাদক আশিস দাস উপস্থিত ছিলেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন কলকাতা মহানগরের মহিলা সমিতির সম্পাদিকা বীণা রস্তোগী।

এই সময়

অবাক বোধোদয়

মধ্যপ্রদেশ মাদ্রাসা বোর্ড ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সিলেবাস বদলানোর সিদ্ধান্ত নিল। সম্প্রতি তারা প্রস্তাবিত সিলেবাসের একটি খসড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে। ইসলামে দেশভক্তির কী মাহাত্ম্য নতুন সিলেবাসে তাই তুলে ধরা হবে।

গ্যাসে বাস

বাসের জ্বালানি গোবর গ্যাস। উল্টোডাঙা থেকে গড়িয়া যাওয়ার ভাড়া মাত্র এক টাকা।

সম্প্রতি কলকাতায় এক বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে চালু হয়েছে এই বাস সার্ভিস। আপাতত বাসের সংখ্যা ১টি। তবে পুজোর মধ্যে রাস্তায় নামবে আরও ১৫টি।

পেপার হাউস

আমেরিকার এলিস স্টেনম্যান সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বাড়ি বানিয়েছেন খবরের

কাগজ দিয়ে। ম্যাসাচুসেটসের রকপোর্ট এলাকায় অবস্থিত বাড়িটির নাম পেপার হাউস। কাগজের বাড়ির বানানোর উদ্দেশ্য গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানো।

হাওড়া তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন

হাওড়া জেলার তাজপুরে গত ২৬ মার্চ শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব কালচার ও সোনার কলকাতা রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় একটি অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন হয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণে এই অ্যাম্বুলেন্স প্রদান ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের জনহিতকর কর্মসূচির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মিত্র, স্টেট ব্যাঙ্কের জনসংযোগ বিভাগের অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল ম্যানেজার মোহন মিত্র, স্টেট ব্যাঙ্কের উলুবেড়িয়া শাখার ম্যানেজার সুব্রত হাজরা, সোনার কলকাতা রোটারি ক্লাবের সভাপতি জিতেন্দ্র দোশী, রোটারি ক্লাবের প্রাক্তন গভর্নর অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট রোটারি কর্মকর্তাগণ এবং তাজপুর পঞ্চায়েত প্রধান-সহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই অ্যাম্বুলেন্সটি কিনতে খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা। স্টেট ব্যাঙ্কের জনসংযোগ বিভাগের ম্যানেজার মোহন মিত্র অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন সংস্থার সম্পাদক তপন রীতের হাতে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রসাদ চক্রবর্তীর জনকল্যাণ কর্মকাণ্ড শুনে অভিভূত হন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য।

'শ্রদ্ধা'র ৮৩তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বীরভূম জেলার সিউড়ি চাঁদনীপাড়া নিবাসী ৮৪ বছরের শ্রীমত্যা আশালতা দে-কে 'শ্রদ্ধা'র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয় তাঁদেরই ভদ্রাসনে। ওঙ্কারধ্বনি

ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সিউড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের নবীন ব্রহ্মচারী গৌতম মহারাজ। হাত-পা ধুইয়ে ফুল, চন্দন দিয়ে পূজন করেন তাঁর একমাত্র পুত্রবধূ শ্রীমতী মঞ্জু দে। সিউড়ি নগরের বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক সুব্রত নন্দন দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমত্যাকে মাল্যদান করেন 'শ্রদ্ধা'র পক্ষে অধ্যাপক নারায়ণচরণ ঘোষ। নামাবলী ও গীতা প্রদান করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়। মানপত্র পাঠ ও প্রদান করেন শ্রদ্ধার পক্ষে বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ ও প্রবীণ স্বয়ংসেবক দিলীপ কুমার ঘোষ।

শ্রদ্ধার পক্ষে সুগায়িকা কৃষ্ণসাধিকা শ্রীমতী বনানী চৌধুরী একটি ভজনগীত পরিবেশন ও শ্রীকৃষ্ণের একটি চিত্র তাঁকে প্রদান করেন। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন কুবীলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শ্রদ্ধার পরিচালন সমিতির কার্যকর্তা সুব্রত সিংহ। অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালন করেন বেণীমাধব উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক সুনীল বিষ্ণু।

অতিথি কলম

যোগী আদিত্যনাথের মুখোমুখি কি দাঁড়াতে পারবেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ?

নলিন মেহেতা

হায়! উদারবাদী বুদ্ধিজীবীরা তোমাদের তো বিসমিল্লায় গলদ। রাজনীতিকে কেবল ধর্মনিরপেক্ষতা আর হিন্দুত্বের তকমায় লড়িয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করার দিন যে শেষ হয়ে গেল!

উদারবাদীরা নিশ্চিতভাবেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে যোগী আদিত্যনাথের নিয়োগে ভয়ঙ্করভাবে খেপে উঠেছেন। গোরক্ষপুরের বাবা গোরক্ষনাথ পীঠের পীঠাধীশ গেরুয়া বসনপরিহিত ব্যক্তিটিকে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিধ্বংসী জয়ের পর সেখানকার সর্বোচ্চ পদে আসীন করাটাকে তাদের সদা সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী মন যেন নিজেদেরই বিদ্রূপ করছে বলে ধরে নিচ্ছেন।

আর বুদ্ধিজীবীদের তরফে কী সাংঘাতিক সব প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করেছে। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ধ্বংসের দিন ঘনিয়ে আসছে! কেউ কেউ মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষীদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের এক মহান যুদ্ধ সমাগত। স্বনামধন্য রাজমোহন গান্ধীর সমবেদনা জাগিয়ে তোলা তুলসীদাস উদ্ধৃত করা মিনতি— যেখানে রথহীন রামচন্দ্র রথারূঢ় রাবণ নিধনের জন্য শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁদের এই ক্ষিপ্ত বক্তব্যের লক্ষ্যবস্তু সেই সমস্ত ধর্মান্তরিত মানুষজন (আদতে হিন্দু) যাদের খেপিয়ে তুলতে পারলে এই উদারবাদী ফৌজ ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বজ্রকঠিন বর্মটিতে যে কাল্পনিক চিড় ধরেছে ঘোষণা করে মুষড়ে পড়েছেন সেই ক্ষত ঠেকাতে তাঁরা যে যথাযোগ্য বাধা দিতে পেরেছেন এই পরিতৃপ্তিটা অন্তত পেতে পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক সত্যটা হলো তাঁরা সম্পূর্ণভাবে হতবুদ্ধিকর অবস্থানে আছেন। তাঁরা সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছেন। সুযোগ হারিয়ে বসে আছেন।

প্রথমত, আদর্শবাদের গগনচুম্বী গালভরা কথাবার্তা সবসময়ই কিছুটা মাদকতাময় হওয়ার ফলে নিজের আত্মশ্লাঘায় কিঞ্চিৎ প্রলেপ দিতে সক্ষম। কিন্তু বাস্তবে নির্বাচনের পর নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ভোটদাতারা আর তাদের সংজ্ঞায়িত আদর্শবাদের ভাবনার তোয়াক্কা না করেই ভোট দিচ্ছে। এই নির্বাচকমণ্ডলীর গরিষ্ঠাংশ তরুণরা নিজেদের পক্ষে যেটা মানানসই বা বাস্তবে কাজে আসবে বা যে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে সে সব বিবেচনা করেই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। বিজেপির যে হিন্দুত্ববাদী চরিত্র আছে সে বিষয়টা তো নতুন কিছু নয়। কেউ তা নিয়ে সন্দেহও প্রকাশ করেনি। কিন্তু নিজেদের অভ্যন্তরীণ ভোটপূর্ব সমীক্ষায় উত্তরপ্রদেশে দলের তরফে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দলনেতা হিসেবে যোগীজীর নামটি সামনে আসায় দল অনেক ভেবে চিন্তে এই হাওয়া টানা মাস্তুলটিতে নিজেদের মোহরটিও লাগিয়ে দিয়েছে মাত্র। কিন্তু এই অনুমোদনই আজ সর্বপেক্ষা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঝুঁকি বলে অনেকের মনে হলেও এই মাস্তুলের টানই দলকে ২০১৯-এর সফল লোকসভা নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাবে এটা বলা যায়। ভীত সন্ত্রস্ত কিছু সমালোচক হতভম্ব হয়ে বলছেন গৈরিক এই দলটি যে চরিত্রে, স্বভাবে, মেজাজে অবিসংবাদিতভাবে হিন্দু একথা তো সর্ববিদিত। বিজেপি আদিত্যনাথকে নিয়োগ করে কিছু নতুন কথা তো বলেনি। এই সমস্তই তো ভোটারদের জানা। হায় ভগবান!

উত্তরপ্রদেশের প্রতীক হিসেবে যোগীকে তুলে ধরে বিজেপি একবারে স্বচ্ছতম রাজনৈতিক সঙ্কেতটি দিয়েছে। এর থেকে জলবৎ তরলং করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে প্রচার অনুযায়ী

> **উত্তরপ্রদেশের প্রতীক হিসেবে যোগীকে তুলে ধরে বিজেপি একবারে স্বচ্ছতম রাজনৈতিক সঙ্কেতটি দিয়েছে। এর থেকে জলবৎ তরলং করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে প্রচার অনুযায়ী কেবলমাত্র ভোট পাওয়ার জন্য দল হিন্দুত্বকে ব্যবহার করে আর ভোটে জিতলেই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এটা অসত্য। না, হিন্দুত্ব এখন উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে।**

কেবলমাত্র ভোট পাওয়ার জন্য দল হিন্দুত্বকে ব্যবহার করে আর ভোটে জিতলেই তাকে ছুড়ে ফেলে দেয়, এটা অসত্য। না, হিন্দুত্ব এখন উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। উন্নয়নের অভিমুখ ও প্রগতির ধারণার সঙ্গে হিন্দুত্বের ধারণারও একটা সাযুজ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই দুইই এখন একে অপরের থেকে অবিচ্ছেদ্য। কখনই দু' দুটি আলাদা বিভাগ নয় যে, যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। কোনো তুষ্টিকরণ নয়, ক্ষোভ ক্ষমা প্রার্থনা নয়, চিন্তায় দ্ব্যর্থবোধক কিছু থাকবে না। এই তিনটিই রাজনৈতিক ত্রি-ফলা মন্ত্র।

এই নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে জাতপাতের সমীকরণে ধস নামা ও মণ্ডল ভিত্তিক ভোট ভাণ্ডার লুঠ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী বিশ্লেষণে যে কঠিন সত্য উঠে এসেছে তাহলো দলের এই ধরনের সরাসরি চিহ্নিত ব্যক্তিত্বের নির্বাচনে দলের হারাবার কিছুই নেই। আজ এটা বাজি ধরে বলা যায় যারা দলের এই কর্ম পদ্ধতিকে তাদের আদর্শগতভাবে পছন্দ করে না তারা কখনই বিজেপিকে ভোট দেবে না। আর বাকি নির্বাচকমণ্ডলী যতক্ষণ উন্নয়নের সুফল এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত হিতসাধন চাক্ষুষ করছে ততক্ষণ তারা আদর্শবাদের ছুৎমার্গ থোড়াই কেয়ার করবে। শুধু তাই নয়, তারা এটাও তীক্ষ্ণ নজর করবে সাংবিধানিক গণ্ডীর মধ্যে থেকে হিন্দুত্ববাদ প্রসারিত হলে তাকে তারা দ্বিধাহীন সমর্থন দেবে। দ্বিতীয়ত ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম হিন্দুত্বের যুদ্ধ ঘোষণা তার কার্যকারিতা বহু আগেই হারিয়ে ফেলেছে। ধর্মনিরপেক্ষীর ডাকে আর সমবেত হবার বিশেষ কেউ নেই তার কারণ তাদেরই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দেওয়া যুক্তির ভণ্ডামি। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বহুজন সমাজ পার্টির দলনেত্রী মায়াবতীর খোলাখুলি মুসলমানদের তাঁবেদারি করা, রাজনৈতিকভাবে কুখ্যাত মোল্লাদের যেমন জামা মসজিদের শাহি ইমাম প্রভৃতিকে নিয়ে রাজনীতি করা। এসব কার্যকলাপ ভোটদাতাদের নজর এড়ায়নি। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়ো যে ধোঁকা, ভণ্ডামি মানুষ তা ধরে ফেলেছে।

এই প্রসঙ্গে ৮০ দশকের নিন্দার্হ সাহাবানু মামলা থেকে শুরু করে এই ২০১৭ সালে এক কুখ্যাত মাংস ব্যবসায়ী গুণ্ডাকে ভোটে দাঁড় করানোর মাধ্যমে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার যা বারোটা বাজার তা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অথচ একই সঙ্গে চলছিল ধোঁকাধারির মাধ্যমে ঘোর ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের ভোট ভিক্ষের কারসাজি। আজম খান থেকে ফসিল হয়ে যাওয়া মোল্লা যাদের একমাত্র কু-উদ্দেশ্যই হলো 'শরিয়া' আইনের কট্টরতম অংশগুলিকে যা বহুকাল অধিকাংশ মুসলমানধর্মাবলম্বী দেশ পরিবর্তন বা বাতিল করেছে তাকে লাগু রাখার মরিয়া প্রচেষ্টা। তিন তালাকের পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এনাদের দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা কতখানি ভাঁওতা।

আদতে জন্মলগ্নের সেই ভারতের বহুত্ববাদ রক্ষা করার জিগির তুলে বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ধরে রাখার নীতিকথা বলে যার শুরু তা আজ কেবলমাত্র মানসিক ভাবে পশ্চাদপদ কিছু গোঁড়া ধর্মীয় দক্ষিণপন্থী মুসলমানের স্বার্থবাহী হয়ে পড়ে ধর্মনিরপক্ষেতার যুক্তিগ্রাহ্যতাকেই সমূলে উৎপাটিত করেছে। তাই আজ বিমুদ্রীকরণের সমালোচকদের মতোই ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বনাশ হয়ে গেল বলে বুক চাপড়ানো 'রুদালী' বাহিনীর কান্নায় দিল্লীর কিছু সুসজ্জিত ড্রইংরুমে কোনো আলোড়ন উঠলেও যেখানে সব চেয়ে বেশি দরকার সেই রাজনৈতিক রাজপথে এই সব মড়াকান্নার আজ কোনো সমব্যথী নেই।

তৃতীয়ত, একজন গেরুয়াবসন সন্ন্যাসী রাজনীতির শাসনদণ্ড হাতে নিয়েছেন এমনটাও নতুন নয়। এর আগে উমা ভারতী পথ দেখিয়েছেন। দিনের শেষে তিনি তাঁর কার্যকালে কী করে যেতে পারলেন সেটাই বিচার্য হবে। হ্যাঁ, 'লাভজেহাদ' আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠা থেকে যারা সূর্য নমস্কার করে না তারা এদেশ থেকে চলে যেতে পারেন, বলার পর নিজস্ব হিন্দু যুব বাহিনীর জন্ম দেওয়ার মতো একান্ত বিশেষত্ব অর্জন করার মাধ্যমে যোগী অবশ্যই এক কট্টরপন্থী ধারার বাহক ছিলেন। পাশাপাশি তাঁর সংসদীয় রেকর্ডটিও কিন্তু ঈর্ষণীয়।

প্রসঙ্গত, পাঁচবারের এই লোকসভা সাংসদ ২০১৪ সাল থেকে মোট ৫৫ বার সংসদীয় বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। তাঁর তোলা প্রশ্নের সংখ্যা ২৮৪টি। নথিভুক্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁর অংশ নেওয়া বিতর্কের মাত্র ১৪.৫ শতাংশ ও প্রশ্নের ক্ষেত্রে মাত্র দু'টি প্রশ্ন ০.৭ শতাংশ ছিল হিন্দুত্ব সম্পর্কিত। গরিষ্ঠাংশই ছিল অন্যান্য বিষয় নির্ভর যার মধ্যে ভোজপুরী ভাষাকে সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্তি করানো থেকে এনসেফেলাইটিস রোগ কিছুই বাদ যায়নি। এর থেকে প্রমাণ হয় এই অগ্নিবর্ষী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী কোনো একমুখী রুদ্রাক্ষ নন। এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বহুমুখী রুদ্রাক্ষের কোন দিকটি তিনি উত্তরপ্রদেশ শাসনকালে ব্যবহার করবেন। পরিসংখ্যান বলছে, শপথ নেওয়ার পর থেকে রোমিও-বিরোধী বাহিনী গঠন, বেআইনি কষাইখানা বন্ধ করার মতো যা কিছু ব্যবস্থাই তিনি নিয়েছেন তার সবগুলিই কিন্তু বিজেপির সঙ্কল্পপত্রে ছিল।

অভ্যন্তরীণ সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে রোমিও-বিরোধী অভিযানের ক্ষেত্রে অনেক সময় অতি উৎসাহের বশে বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার সংশোধন তিনি সরাসরি জনতার দরবারে গিয়ে ঘোষণা করেছেন। এতেই পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর কৌশলগতভাবে সজাগ থাকার প্রবণতা। তাঁর শাসনভার গ্রহণের পর প্রথম দেওয়া ভাষণটিও ভরে রয়েছে বিজেপির উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির আনুপূর্বিক বর্ণনায়। এরই মধ্যে ছিল ৬ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুবের ঘোষণা।

একটা কথা হলফ করে বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মেরুকরণের হিংসাশ্রয়ী হওয়া থেকে বিরত রাখবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতই তাঁকে 'হিন্দু দানব' বলে গালি গালাজ করা হোক, সবই আগেকার মোদীকে বলা কুকথার মতোই নিষ্ফল হয়ে যাবে। যতই ধর্মনিরপেক্ষীরা তাঁর সমালোচনা করবেন ততই ফুলে ফেঁপে উঠবে তাঁর অনুরাগী ভোটভিত্তি। আজ উদারবাদীদের সত্যি নতুন গপ্পো চাই। তারা আজ বড়ই শূন্যকুম্ভ। সেই পুরনো এঁদো ধর্মনিরপেক্ষতার ফেঁতা ফেলে দিয়ে তাঁদের শিকড়ে গিয়ে নতুন কিছু আবিষ্কার না করলে মহা বিপদ।

চিঠিপত্র

বর্তমান ভারতে বিজেপি

বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনতা পার্টির গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় বসেন এবং দেশের ঘুণধরা সমাজকে স্বচ্ছতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এরই ফলস্বরূপ ২০১৬ সালে ৪ নভেম্বর পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল করেন।

নোট বাতিলকে যে সাধারণ মানুষ দু-হাত ভরে সমর্থন করেছেন তার প্রমাণ নোট বাতিলের পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যাপক সাফল্য। আগামী বছরের নির্বাচনগুলিতে এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির বিজয়রথ এগিয়ে চলবে তা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার একটি উদ্ধৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন— 'সারা ভারতে আজ গ্রহণযোগ্য নেতা নেই যিনি মোদীকে এবং ২০১৯-এ বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এই হিসেবে ২০১৯-এর কথা ভুলে যেতে হবে আর ২০২৪-এর জন্য পরিকল্পনা বা আশা করতে হবে।'।

—অসীম সাহা (শিক্ষক),
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

আবার পরিবর্তন চাই?

'আশায় বাঁচে চাষা'। বঙ্গবাসীর অবস্থাও তাই। এক বুক আশা নিয়ে বাম জগদ্দল পাথরকে উপড়ে ফেলেছিল বাঙালি জনতা। কিন্তু আশার গুড়ে বালি। আবার প্রমাণিত হলো, যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ! সিপিআইএম হয়ে উঠেছিল, 'ক্রিমিনাল পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট)'। সময় লেগেছিল ৩৪ বছর। আর সাত বছরে টিএমসি হয়ে উঠেছে 'টিম অব মানি অ্যান্ড করাপশন'।

মা-মাটি-মানুষের বিরোধিতা করতেই যেন তৃণমূলের জন্ম। রাজ্যের অপগণ্ডদের শান্তির নীড় হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলে সম্মান আর পদলাভের একমাত্র মাপকাঠি দুর্নীতি আর দিদি-আনুগত্য। অনুব্রত মণ্ডল আর দীনেশ ত্রিবেদী জ্বলন্ত উদাহরণ।

দেখা যাচ্ছে, নারদ কাণ্ডে তৃণমূলীরা সরাসরি অবৈধ উৎকোচ নিচ্ছেন। সারদা কাণ্ডে অবৈধ কাজে মদত দিয়ে টাকার পাহাড় বানাচ্ছেন। এমতাবস্থায় চারদিকে আবার পরিবর্তনের ডাক। এবার বিজেপির পালে হাওয়া। সাম্প্রতিক চার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে মোদী তথা বিজেপির বিজয়রথ চরম গতিতে। মিডিয়া এবং বিরোধী দলগুলির থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে। ডিমনিটাইজেশন ও হিন্দুত্বকে সঙ্গে নিয়েই মোদী ঝড় আছড়ে পড়েছে বাংলার কোলে। এবার বাঙালি কী করবে?

বামেরা বিগত ৩৪ বছর শুধু জনতাকে দেবো দেবো করে রাজ্যটাকে দেনায় ডুবিয়েছে। সর্বহারাদের নেতারা এসি গাড়ি বাড়ি করে ফেলেছেন। আর সাত বছরে তৃণমূলীরা দ্বিগুণ, তিনগুণ, একশো গুণ, কারো আবার হাজার গুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। হতভাগ্য জনতা সরকারি 'শ্রী'তে মুখরিত। কেউ বেকারশ্রী, কেউ কন্যাশ্রী, কেউ যুবশ্রী। ধর্ষিতা হলে টাকা পাচ্ছে, মদ খেয়ে মরলে টাকা পাচ্ছে। ক্লাব পাচ্ছে নগদ নারায়ণ। সাইকেল, মোবাইল, ট্যাব...কত কী। কোন কালে কোন সরকার এত দিয়েছে? বাঙালি আজ কাঙালি। ফ্রিতে পেতে বড় ভালোবাসে। চলছে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। যদিও এ ধরনের রাজনীতির কারবারি যাদব ও গান্ধী নেতারা সাম্প্রতিক উত্তরপ্রদেশে পর্যুদস্ত হয়েছেন।

কেউ বলছেন, বিজেপির বাংলায় সংগঠন নেই? কেউ বলছেন, সংগঠন হোক, সবাই মিলে বিজেপি করবো। আবার পরিবর্তন হবে বাংলায়। কেউ বলছেন বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িকতা চায় না। বাংলায় বিজেপির কোনো চান্স নেই। মণিপুরে তৃণমূলী বিধায়ক বিজেপিকে সমর্থন করাতে কেউ কেউ গটআপ দেখছেন। কিন্তু বাংলার মন কি চায়, সত্যি বুঝেছি আমরা?

'ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়'। সততার প্রতীক মমতা দিদিকে দুর্নীতির পক্ষে সওয়াল করতে দেখে বিজেপিতে বাঙালির ভরসা আসবে তো? বামফ্রন্টকে হটিয়ে রাজ্যের তখতে বসেই বামেদের 'পচা-দাগি' গুণীদের কদর দিলেন। সংগঠন বাড়বে বলে। গণতন্ত্রে গণদেবতা যদি সহায় থাকে চৌত্রিশ বছরের সংগঠন উৎখাত হয়, প্রমাণ হলো। তবু জনতাকে ছেড়ে সংগঠনে জোর কেন? নেতাদের জনতার ভালোবাসা আর সততায় বিশ্বাস নেই? তৃণমূলের মতো বিজেপিতে যদি সংগঠনের দোহাই দিয়ে অন্য দলের বর্জ্য অপাংক্তেয়গুলি ভিড় জমায়, তবে জনতার কি কোনো লাভ হবে? তবে তো পরিবর্তন হয়ে বিজেপি এলেও তৃণমূলের মতো 'অতিবাম গণশত্রু'র পুনরাগমন হবে।

—বরুণ মণ্ডল,
তিলডাঙ্গা, ন-পাড়া, রাণাঘাট, নদীয়া।

শ্রীজাত আপনি কি বাঙালি সমাজের মানদণ্ড?

আমি আপনার উদ্দেশে করা এফ আই আর-এর তীব্র নিন্দা করছি এবং সভ্য শিক্ষিত বাঙালি নাগরিক সমাজকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানাচ্ছি। এই অশিক্ষিত অভদ্র ছেলেটির কী সাহস দেখুন, আপনার মতো একজন মহান কবি যিনি এখনকার সময়ে নিজেকে যুবক রবীন্দ্রনাথ হিসেবে প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন, তার সাহিত্যচর্চায় এই অশিক্ষিতের দল কিনা বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে। কী দিনকাল পড়েছে

দেখুন দেখি! কী চরম অসহিষ্ণুতা তাও আবার এই সভ্য বাঙালি রাজ্যে? প্রসঙ্গত বলে রাখি, কোথাও কেউ কোনো অন্যায় কথা বলে থাকলে তা পত্র লেখক সমর্থন করে না!

প্রথমত, এই ছেলেটির লেখা এফ আই আর-এ আসি। আপনি ঠিকই বলেছেন এরা ঠিক করে শুদ্ধ ভাষায়, বিনা বানান ভুলে একটা এফ আই আর লিখতে পারে না তারা আপনার মতো এত বড়ো কবির সাহিত্যচর্চায় বাধা দিচ্ছে— এটা কীভাবে বাঙালি মেনে নেবে? জানেন তো আগের যুগের কবি-সাহিত্যিকরা তো আর গর্ভনিরোধক নিয়ে সাহিত্য রচনা করে নাম খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি, তাই এখনকার লোকগুলো আপনাদের তৈরি করা এই নতুন সাহিত্য ধারার মান ঠিক বুঝতে পারছে না! আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি এর আগেও অনেক বিপ্লবী কবিতায় প্রতিবাদ করেছেন। যেমন— পার্কস্ট্রিটে ধর্ষণ, বাংলায় ঘটে যাওয়া কলিগ্রাম, কালিয়াচক, ধুলাগড়ে হিন্দু নিধন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর অপূর্ব ভাষায় কিরানা (ইউপি)-তে গণহিন্দু পরিবার বিতাড়ন, তসলিমা নাসরিনের নির্বাসন এমন অনেক ঘটনা। ভাববেন না, আমাদের মতো অনেকেই আপনার এই কবিতার ভাব বুঝতে পারছে হাড়ে হাড়ে। এইসব ক্ষেত্রে আপনার প্রতিবাদী কবি চেতনা কলম ধরেছে বটে, কিন্তু তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সামনে এসে উঠতে পারেনি কোনো এক অজানা যোগসাজসে! তাই প্রতিবাদী মন ও সমাজ সচেতন চিত্তের বহর না করলেই বোধহয় ভালো করতেন! যদি বিশেষ কোনো দলের বুদ্ধিজীবী বা বিত্তজীবী হয়ে বাঁচতে চান বাঁচুন, দয়া করে নিজেকে বাঙালি মনের ও সমাজের একমাত্র মুখ হিসেবে জাহির করতে না গেলেই বোধহয় ভালো করবেন। আসলে শুধু ছাপোষা কবিতা লেখা দিয়ে তো আর দিন চলে না, আর সেলেব্রিটিও হওয়া যায় না, আর বিভিন্ন পুরস্কার পাওয়া তো ছেড়েই দিলাম। যতদূর মনে পড়ে আপনি তো শাসকদলের হয়ে দু'কলি লিখেছিলেন। কিন্তু যে কবিমনের এত সমাজ চেতনা, সেই মন শেষে রাজনৈতিক দলের দাস হয়ে গেল? না না কিছু মনে করবেন না, আমি বুঝি! মনে রাখবেন, সময় সব ঠিক করে দেয় কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক। তাই আপনার কাঁধে যখন মুখোশের আড়ালে রাজনীতির কথা প্রচারের গুরু দায়িত্ব আছে, বিচারের এই কঠিন দায়িত্ব তা না হয় নাই নিলেন?

নিজের ব্যক্তিগত মতকে জনগণের মত বলে রাজনৈতিক প্রচার করা থেকে বিরত থাকুন। যে ইউপি জনমতের বিরুদ্ধে আপনি আপনার অপ-শব্দ ব্যয় করলেন, আপনার জ্ঞান কি সেই সমষ্টিগত মেধার থেকেও জোরালো?

আপনাদের মতো কিছু মানুষ নিজেদের কু-মেধার জোরে সমাজের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দিতে চায় এই বলে যে, 'আমরা জানি সমাজের পক্ষে কোনটা ভালো!' জ্ঞানের কলমে সত্যিই এত জোর থাকলে সমাজ পরিবর্তন করে দেখান অথবা সমাজের মানুষের মতো (যদিও তা আপনার মতো মানুষের মতের থেকে ভিন্ন) তা মেনে নিন। এটা মেধা ও জ্ঞান দুইয়েরই পরিচায়ক।

এই লেখার প্রসঙ্গে বলে রাখি, আমার কটি বানান ভুল হয়েছে আপনার কাছ থেকে শুনতে হবে নাতো! এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ব্যবহার করে এমন সফটওয়্যার ব্যবহার করে লেখা, তাই বানান জনিত কিছু ত্রুটি থাকতে পারে যা পত্রলেখক জেনেও পরিমার্জনা করতে অপারগ, তার জন্য আপনার মতো বিশেষ কবির কাছে বিশেষ ভাবে ক্ষমা প্রার্থী।

তবে প্রযুক্তি কিছুটা বোঝেন আপনি, নাহলে দেখুন কিরকম একটা রদ্দি মার্কা কবিতা লিখে কেমন সস্তায় পাবলিসিটি পেয়ে গেলেন!

—**ভাস্বর গোস্বামী,**
বেঙ্গালুরু।

রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার দশা

গত ১৬ মার্চ আমার স্ত্রী ঝর্ণা ঠাকুরের পেটের ইউএসজি করাতে গিয়েছিলাম সোনোস্ক্যান, মালদাতে। সকাল ৯টায় নাম লেখাই এবং ছবি করার সুযোগ হয় দুপুর ২-৩০ মিনিটে। ছবি করতে নিয়ে গেলে আমার স্ত্রী টেবিলেই বমি করে এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন আমাকে বলা হয় এখানে ব্যবস্থা নেই।

তারপর মালদা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্ট্রেচার আনার জন্য আমাকে বলা হয়। একটু রাগারাগি করলে একজন সঙ্গে আসে এবং ভর্তি করা হয়। আমাকে বলা হয় টাকা দিলে বেড দেওয়া হবে। আমি টাকা দিতে অস্বীকার করলে মেঝেতে বিছানা করতে বলে। পাশের রোগী বলে বেড ফাঁকা আছে। তারপর বেডে নিয়ে যায়। স্ট্রেচার বয় রোগীর বাড়ির লোককে স্টেচার ফেরত দিয়ে আসতে বলে। আমি বলি সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমিও কিছু নিয়ম জানি। কিছু পরে নার্স একটি ইনজেকশন দিতে আসে। বলে বাড়ির লোককে রোগীকে ধরতে হবে। দু'বার চেষ্টা করার পর নার্স চলে যায়। তারপর অন্য রোগীর আত্মীয়ের সহায়তায় ইনজেকশন দেওয়া হয়। সেলাইনের চ্যানেলও ঠিক একইভাবে করা হয়। সেলাইন শেষ হলে পাল্টানোর জন্য বলি। নার্স বলে আর প্রয়োজন হবে না। তারপর আমাকে সই করতে বললে, আমি জিজ্ঞাসা করি কী হয়েছে? নার্স বলে রোগীর অবস্থা খারাপ।

রাত্রি ৯টায় একটা ইনজেকশন দেওয়া হয় পাশের রোগীর আত্মীয়র সহায়তায়। রাত্রি ৩টা আমার স্ত্রী মারা যায়। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল। মারা যাওয়ার কারণ আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলাম না। প্রশ্ন জাগে, পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করে কী অন্যায় করেছি? হসপিটালে চিকিৎসাধীন স্ত্রীর মৃত্যু কীভাবে হলো জানতে পারব না?

পত্রের মাধ্যমে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—**ধনঞ্জয় ঠাকুর,**
খাসচাঁদপুর, কালিয়াচক,
মালদা।

রামায়ণ এবং পুরুষোত্তম শ্রীরাম

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

পুরুষোত্তম কে? কাকে আমরা পুরুষোত্তম আখ্যায় আখ্যায়িত করব? পুরুষোত্তম অর্থে উত্তমপুরুষ, আদর্শ পুরুষ। তাঁকেই আমরা পুরুষোত্তম আখ্যা দেব— যিনি সমাজ, রাষ্ট্র, সর্বোপরি সমগ্র মানবজাতিকে সত্য, ধর্ম এবং ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করবেন। নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে শিক্ষা দেবেন— আদর্শ জীবনযাপন কেমন হতে পারে, কেমন হওয়া উচিত। যাঁর শিক্ষা হবে কালোত্তীর্ণ, সর্বজনের হিতার্থে---একমাত্র তিনিই পুরুষোত্তম হতে পারেন। কয়েক সহস্র বৎসরের ভারত ইতিহাস যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখব, পুরুষোত্তম চরিত্র হলেন একটিই। তিনি শ্রীরামচন্দ্র। যিনি বরাবর যুগোপযোগী, যিনি বরাবর সমসাময়িক। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে যিনি ধর্ম, ন্যায় এবং সত্যের পথে অবিচলিত থাকার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, দিয়ে যাচ্ছেন এবং অনাগত কালেও দিয়ে যাবেন। রামায়ণ হচ্ছে এই পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের জীবনচরিত। রামচন্দ্র কেন পুরুষোত্তম তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, আগে একটু সংক্ষেপে দেখে নিতে হবে, রামায়ণ কেন কালোত্তীর্ণ, রামায়ণ কেন সর্বকালীন, সর্বজনীন।

রামায়ণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন— 'স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আমি যত বড় সমালোচকই হই না কেন, একটি সমগ্র দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রবাহিত সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয়, তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।' (দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায়)। পাশ্চাত্যের আদর্শের অন্ধ অনুগামী যে ভারতীয়রা চিরকাল রামায়ণকে হতশ্রদ্ধা করে এসেছেন, এখনও করছেন— তাঁদের প্রতি কবির এ এক মোক্ষম জবাব। ভারতবর্ষের মতো প্রাচীন একটি দেশের কাল-কালোত্তরের যে ইতিহাস তার দর্পণ হিসাবেই রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছিলেন রামায়ণকে। হার্ভার্ড-ফেরত ইতিহাসবিদদের মতো রবীন্দ্রনাথ একে নিছক প্রাচীন কবির কল্পকাহিনি বলে উড়িয়ে দিতে চাননি। রামায়ণের যে বিশাল ব্যাপ্তি তাও ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায়, সাধারণের ধারণায় যাকে 'এপিক' বলা হয়— তার গণ্ডিতে রামায়ণকে সীমাবদ্ধ করে রাখা অনুচিত। বরং, রামায়ণের ব্যাপ্তি তার থেকেও অনেক বেশি। আমরা সাধারণত তাকেই এপিক আখ্যা দিই— যে কাব্যে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পেয়েছে যেমন ইলিয়াড ও ওডিসি। কিন্তু রামায়ণ শুধু বীররসই প্রাধান্য পেয়েছে— এমন বলা ঠিক হবে না। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ আছে, শৌর্যবীর্য বীররসও যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেইটি রামায়ণের সব নয়— সেখানেই রামায়ণ শেষ হয়ে গিয়েছে— তাও নয়। আবার ভগবান বিষ্ণুর রাম অবতারে মর্ত্যে লীলাই যে রামায়ণের একমাত্র প্রতিপাদ্য— ব্যাপারটা সেরকমও নয়। অর্থাৎ রামায়ণকে নিছক একটি ধর্মগ্রন্থ বলে অভিহিত করাও অনুচিত। এপিক বা ধর্মগ্রন্থের পরিসরে রামায়ণকে বেঁধে রাখা যাবে না। তাহলে রামায়ণ কী? রামায়ণ হচ্ছে প্রকৃত অর্থে মানুষের আদর্শ জীবনযাপন কেমন হতে পারে— তার একটি দিকনির্দেশিকা। এক কথায় একটি আদর্শ চরিত বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্পর্ক, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি— ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।' ('রামায়ণী কথা'-র ভূমিকা)

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে গার্হস্থ্য আশ্রম অত্যন্ত উচ্চস্থান অধিকার করে ছিল। ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ, সঙ্কীর্ণ চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বে এখন যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ায়— গার্হস্থ্য আশ্রমের মূল লক্ষ্য এবং আদর্শ থেকে আমরা অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছি। তবু, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, এখনও দেখতে পাব, গার্হস্থ্য আশ্রম তার উচ্চ আদর্শকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। রামায়ণ এই গার্হস্থ্য আশ্রমের উচ্চ আদর্শকেই সপ্রমাণ তুলে ধরেছে। প্রাচীন ভারতে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে শিক্ষা দেওয়া হতো— তা কখনই ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার লক্ষ্যে ছিল না। বরং সমষ্টির সুখ, সমষ্টির সমৃদ্ধির জন্য এই গার্হস্থ্য আশ্রম ভারতের আদর্শ ছিল। গার্হস্থ্য আশ্রম সমাজকে ধারণ করে রাখত এবং মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করে তুলত। এই গার্হস্থ্য আশ্রমই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার ভিত্তি। রামায়ণ বিভিন্ন ঘটনাবলী, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই সেই গার্হস্থ্য আশ্রমের উপযোগিতা এবং মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজা দশরথ তাঁর সন্তানদের ভিতর দিয়ে এই গার্হস্থ্য আশ্রমের শিক্ষা দিয়েছেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্ন— তিন মাতার তাঁর সন্তান। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

দশরথ কিন্তু তাঁদের ভিতর সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট করতে, ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার শিক্ষা দিতে রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ এবং ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নকে জুড়ে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই— বৈমাত্রেয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ভিতর কোনো হীনস্বার্থ যেন দূরত্ব সৃষ্টি না করে। তা যে করেনি— রামায়ণে তা আমরা দেখতে পাই। একাত্ম মানবতাবোধের যে দর্শন দিয়েছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়— তার বীজ তো নিহিত রামায়ণের এই গার্হস্থ্য আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'এই রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবণিতা, আপামর সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে। ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।' আর এই কারণেই রামায়ণ চিরকালীন। এস ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ' নিবন্ধে প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে এই রামায়ণের সূত্রেই এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক বন্ধনে বাঁধা— সেই চিত্রই ধরা পড়েছে।

রামায়ণের এই মহৎ আদর্শই বর্ণিত হয়েছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের মাধ্যমে। এই উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে বলেই শ্রীরাম ভারতীয় জীবনের আদর্শ পুরুষ— পুরুষোত্তম। রাম চরিত্রের ভিতর একাধারে আমরা দেখা পাই পিতৃপরায়ণ সন্তান, স্নেহশীল ভ্রাতা, বীরশ্রেষ্ঠ প্রজাপরায়ণ রাজা এবং একজন আদর্শ স্বামীর। রামায়ণে আমরা দেখি, রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেক করতে চাইলে দশরথপত্নী কৈকেয়ী কুবুদ্ধিসম্পন্না মন্থরার পরামর্শে তাতে বাদ সাধেন। দশরথের পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কৈকেয়ী তাঁর কাছে দাবি করেছিলেন, রামকে চোদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে এবং রামের স্থলে ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাতে হবে। কৈকেয়ীর এই দাবির সামনে রাজা দশরথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেও, পিতৃসত্য রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছিলেন রাম। স্বেচ্ছায় তিনি বনবাসের নিদান মাথাপেতে নিয়েছিলেন। পিতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা রক্ষার দায়িত্ব পুত্রের হবে কেন— এমন প্রশ্ন তুলে রাম কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসন দখল করেননি। বরং, পিতৃসত্য রক্ষার্থে এক মহৎ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পুত্রশোকে অধীর রাজা দশরথ রামের বনবাস যাত্রার ক'দিন পরেই দেহত্যাগ করেছিলেন। দশরথের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর ভ্রাতা ভরতের অনুরোধেও অযোধ্যায় ফিরে আসেননি রাম। বরং পিতৃসত্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চোদ্দ বৎসর বনবাসে অতিক্রম করেছিলেন। শুধু পিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নয়; মাতা এবং মাতৃসমাজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শনও পাওয়া যায় রামচন্দ্রের চরিত্রে। বনবাসে যাওয়ার পূর্বে মাতা এবং বিমাতা- সকলের কাছেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন রামচন্দ্র। যে কৈকেয়ীর জন্য তাঁর বনবাস— তাঁর কাছে গিয়েও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে দ্বিধা করেননি রামচন্দ্র। এমনকী বনবাস এবং লঙ্কাবিজয় সমাপ্ত করে অযোধ্যায় ফিরে এসে রাম প্রথমেই সাক্ষাৎ করেছিলেন কৈকেয়ীর সঙ্গে। কারণ, রামের মনে এই আশঙ্কা ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতে না জানি কৈকেয়ীর উপর কত লাঞ্ছনা হয়েছে!

রামায়ণে দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় ভ্রাতৃপ্রেম। কৈকেয়ী চেয়েছিলেন, রাম বনবাসে গেলে ভরত অযোধ্যার রাজ্যপাটে বসুক। সে সুযোগ ভরতের সামনে ছিল। দশরথের মৃত্যুর পর রামের অনুপস্থিতিতে ভরত অনায়াসেই অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠান করতে পারতেন। কিন্তু মাতা কৈকেয়ী চাইলেও ভরত তাঁর বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাননি। বরং, দশরথের মৃত্যুর পর ভরত রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পিতৃসত্য রক্ষার্থে রাম ফেরেননি। কিন্তু রামচন্দ্র যতদিন বনবাসে ছিলেন, ততদিন তাঁর পাদুকা সিংহাসনে রেখে অনুগত সেবকের মতো রাজ্য পরিচালনা করে গিয়েছেন ভরত। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি রাজ্যপাট রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিতে। এই ভ্রাতৃপ্রেমের নিদর্শন আমরা পাই শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর অন্য ভ্রাতাদের ভিতরেও। যেমন লক্ষ্মণ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি এতটাই অনুরক্ত ছিলেন লক্ষ্মণ যে, বনবাসে রামের সঙ্গী হতে দ্বিধা করেননি। লক্ষ্মণের বনবাসে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না— তবু রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত লক্ষ্মণ চোদ্দ বছরের এক অনিশ্চিত এবং কষ্টকর জীবনযাপনকে বেছে নিয়েছিলেন। তেমনই রামচন্দ্রকেও দেখি তাঁর ভ্রাতাদের প্রতি কখনও ঈর্ষা বা অসূয়া প্রদর্শন করছেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভরত রাজ্যপাটে আসীন হবেন জেনেও ভরতের প্রতি কোনো ঈর্ষা বা দ্বেষ নেই রামচন্দ্রের মনে। বনবাস পর্বে দেখি— পিতার স্নেহে আড়াল করে রেখেছেন লক্ষ্মণকে। রাবণ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মণ মারাত্মকভাবে আহত হলে— রামচন্দ্র শোকে আকুল হয়ে পড়েছিলেন। রামচন্দ্রের নির্দেশে হনুমান বিশল্যকরণীর সন্ধান করে এনে লক্ষ্মণের জীবনদান করেছিলেন। রামায়ণ অধ্যয়ন করলে এটা বোঝা যায়— রামচন্দ্রের স্নেহপরায়ণতা, এবং দায়িত্বশীল আচরণ তাঁর ভ্রাতাদেরও শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিল রামচন্দ্রের প্রতি। সংসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরিত্র কেমন হবে— রামচন্দ্র চরিত্রের ভিতর দিয়ে সে আভাসও আমরা পাই।

বনবাস এবং লঙ্কাবিজয়ের পর আমরা রামচন্দ্রকে পেয়েছি একজন সদর্থক ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাপালক রাজা হিসাবে। রামচন্দ্র নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে, কঠিন জীবনযাপন করে, স্ত্রী বিচ্ছেদ সহ্য করে, অশুভকে বিনাশ করে— তারপর ফিরেছেন অযোধ্যায়। তখন প্রজাপালন তাঁর কাছে মুখ্য কর্তব্য। এক প্রজাপালক নৃপতি হিসেবে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে কর্মযোগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখতে হয়েছে। প্রজাকল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখতে এই পর্বে তাঁকে সীতাকে ত্যাগের মতো শ্রেষ্ঠ এবং প্রতীকী ত্যাগের নিদর্শনও রাখতে হয়েছে। এই ত্যাগের বিচারে শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভগবান বুদ্ধের পথিকৃৎ। ভগবান বুদ্ধ আত্মমুক্তি কল্পে স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন। রামচন্দ্র স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন প্রজাকল্পে। চোদ্দ বৎসর বনবাস এবং লঙ্কাবিজয় সমাধা করে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। তাঁর সামনে তখন একটাই লক্ষ্য— এক প্রকৃত কল্যাণকামী 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠা। রামচন্দ্র জানতেন, এই কল্যাণকামী রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে— ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিসুখ ইত্যাদির উপরে তাঁকে স্থান দিতে হবে প্রজাকল্পকে। ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যক্তিসুখের সঙ্গে কোনোরকম আপোশ করা চলবে না। করেননি বলেই প্রজাকল্পে সীতাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। রামায়ণের সমালোচকরা এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্রের সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু

সেটা করেন পরিপ্রেক্ষিত বিচার না করেই। অযোধ্যায় ফিরে এসে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে প্রজাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ না করলেও পারতেন। কিন্তু রামচন্দ্র এটি বুঝেছিলেন— সীতাকে ত্যাগের দৃষ্টান্ত যদি তিনি না রাখতে পারেন, তাহলে প্রজাবিদ্রোহ হবে। রাজ্যে অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা বাড়বে। এই দ্বন্দ্বে প্রজাকল্পই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল। নিজের চাওয়া-পাওয়া নয়।

অথচ এই রামায়ণেই আমরা দেখছি— রামচন্দ্র একজন স্নেহশীল, প্রেমপরায়ণ স্বামী। সীতার প্রতি ভালোবাসায় তাঁর কোনো খামতি নেই। রামচন্দ্র যখন বনবাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন সীতাদেবী তাঁর অনুগমন করতে চাইলে, রামচন্দ্র প্রথমে অনুমতি দিতে চাননি। রাজপ্রাসাদের বিলাস ত্যাগ করে বনবাসের ক্লেশ সীতাদেবী সহ্য করুন এটা রামচন্দ্র চাননি। তবু, সীতাদেবী যখন দৃঢ়তার সঙ্গে রামচন্দ্রের অনুগামিনী হওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করেন, তখন রামচন্দ্র আর 'না' করেননি । স্ত্রীর সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। স্ত্রীর ইচ্ছাকে অমর্যাদা বা পদদলিত করা নয়, বরং তাঁকেও ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সমগ্র নারীজাতিকে মর্যাদার আসনে বসানোর শিক্ষাটি রামচন্দ্রই দিয়ে গিয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি রামচন্দ্রের অনুরাগের প্রকাশও আমরা রামায়ণে পেয়েছি। বনবাসকালে মারীচের মায়ামৃগ ধরে আনার জন্য রামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন সীতাদেবী। রামচন্দ্র বুঝেছিলেন, ওই মায়ামৃগ আসলে রাক্ষসদের মায়া। তবুও স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিয়ে ওই মায়ামৃগের পিছনে ধাবিত হয়েছিলেন তিনি। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলে স্ত্রীর সন্ধানে আকুল রামচন্দ্রকে অরণ্য, গিরি অতিক্রম করে ছুটে যেতে দেখেছি আমরা। প্রজাকল্পে সীতাকে ত্যাগ করার পরও তাঁকে কিন্তু এক মহূর্তের তরেও বিস্মৃত হননি রামচন্দ্র। সীতার শোকে অধীর হয়েছেন। সোনার সীতামূর্তি পাশে বসিয়ে রাজ্যশাসন করেছেন। সীতাদেবীর অনুপস্থিতিতে অন্য কারোকেও পত্নীত্বে গ্রহণ করেননি। শেষ পর্যন্ত, সীতাদেবীরই স্বামী হিসেবে থেকে গিয়েছেন তিনি। সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশের পর সরযূর জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রামায়ণ আরও একটি শিক্ষাও দিয়েছে। প্রাচীন ভারতে বহু বলবীর্যশালী নৃপতি বহুবিবাহে এবং বহুগামিতায় অভ্যস্ত ছিলেন। স্বয়ং দশরথেরই বহু বিবাহের পরিচয় পাই আমরা। কিন্তু রামচন্দ্র এবং তাঁর তিন ভ্রাতা— এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এইসব ক্লিন্নতার ঊর্ধ্বে। তাঁদের কারোরই বহুগামিতার অভ্যাস ছিল না। একজন স্ত্রীর প্রতিই তাঁরা অনুরক্ত এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। এমনকী, রামচন্দ্রের অনুগামী যাঁরা— সুগ্রীব, জাম্বুবান, হনুমান, দ্বিবিদ— এঁদের কারো বহুগামিতার অভ্যাস ছিল না। একজন ন্যায়নিষ্ঠ প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির সমাজে এবং সংসারে কী ভূমিকা হওয়া উচিত— রামচরিত্র সে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

রামচরিত্র বা রামায়ণ শুধু এটুকু শিক্ষাই দেয়নি। রামচন্দ্র বৃহত্তর ভারতীয় সমাজগঠনের শিক্ষাটিও দিয়ে গিয়েছেন। রামায়ণের বনবাসকালে আমরা দেখতে পাই বনবাসী-আদিবাসী-মূলনিবাসীদের জীবনযাত্রা, তাদের আচার-আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, ভালোবাসা দিয়ে তাদের হৃদয় জয় করার শিক্ষা রামচন্দ্র দিয়ে গিয়েছেন। বনবাসপর্বে রামচন্দ্র আতিথ্য গ্রহণ করছেন অরণ্যবাসী রাজা গুহর; স্বর্ণলঙ্কা অভিযানে রঘুবংশজাত রামচন্দ্রের বন্ধু এবং সংগ্রামের সাথী হয়েছে বনবাসী গিরিবাসী-মূলনিবাসীরা। মনে রাখতে হবে, কোনো রাজানুগ্রহ দিয়ে নয়, অরণ্যনিবাসী রামচন্দ্র এদের হৃদয় জয় করেছেন ভালোবাসা দিয়ে। রামচন্দ্র এই শিক্ষাই দিয়েছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে যে বনবাসী, মুলনিবাসীরা এদের হৃদয় জয় করতে রাষ্ট্রক্ষমতা লাগে না, লাগে না সংরক্ষণ নীতি। দরকার শুধু একাত্মতাবোধ। এই একাত্মতাবোধে রামচন্দ্র এদের আবদ্ধ করেছিলেন বলেই সুগ্রীবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মূলনিবাসীরা নিঃশর্তে রামের বাহিনী হিসেবে জড়ো হয়েছেন কিষ্কিন্ধায়। আর যে শিক্ষাটি দিয়েছে রামায়ণ— তাহলো জাতীয়তাবোধের শিক্ষা, দেশকে ভালোবাসার শিক্ষা। অরণ্যে রাক্ষসদের উৎপাত বন্ধ করতে এবং তাদের দমন করতে কিশোর রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে ঋষি বিশ্বামিত্র দশরথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু সে কী শুধুই রাক্ষস বধের জন্য? তা তো নয়। রামায়ণ পাঠে আমরা দেখতে পাই এই দেশের সঙ্গে, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে, অধিবাসীদের সঙ্গে, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে রামকে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যও তো ছিল বিশ্বামিত্রর। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র চলেছেন অরণ্যে। এই যাত্রাপথে বিশ্বামিত্র একের পর এক রাজ্য চেনাচ্ছেন রামচন্দ্রকে। সেইসব রাজ্যের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজজীবন, প্রাকৃতিক গড়ন, শস্য, রাষ্ট্রনীতি— সবই উঠে আসছে বিশ্বামিত্রের বর্ণনায়। মুগ্ধ শ্রোতা রাম চিনে নিচ্ছেন এই মহান ভারতবর্ষকে। বিশ্বামিত্রের এই শিক্ষা দেশকে কতটা ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল রামচন্দ্রকে, তার প্রমাণও আছে রামায়ণে। লঙ্কাবিজয়ের পর লক্ষ্মণ যখন সেখানেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন— তখন রামচন্দ্রই তাঁকে বলছেন— 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী...' এই জন্মভূমি জননী স্বর্গের তুল্যই গরিমামণ্ডিত। এর চেয়ে বড় জাতীয়তাবোধের পরিচয় আর কিছু কি হয়?

এই মর্যাদাসম্পন্ন রামচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'রামচন্দ্র হচ্ছেন সেই ব্যক্তিত্ব যাঁর স্নেহ-ভালোবাসা আচণ্ডালে প্রবাহিত হয়েছে। রামচন্দ্র হচ্ছেন সত্য এবং ন্যায়ের প্রতীক। এই ভারতবর্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং বুদ্ধ অবতারে অবতীর্ণ হয়েছেন।' তবে রামচরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে সীতাদেবীরও উল্লেখ করতে হবে। কারণ, সীতা ছাড়া রামচন্দ্র অসম্পূর্ণ। স্বামী বিবেকানন্দ সীতাদেবীকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বলেছেন, 'স্ত্রী হচ্ছেন স্বামীর কর্মপথের সঙ্গী। বিবাহের সময় পুরোহিত স্বামী-স্ত্রীকে বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। সীতা অশেষ দুঃখ সহ্য করেছেন। অশেষ ক্লেশ সহ্য করেছেন। তবুও তিনি পতিব্রতা। স্বামীর সমস্ত ক্লেশকে তিনি সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন। দিগন্তে চন্দ্রশোভার মতো সীতার অবস্থান। তিনি হচ্ছেন ভারতীয় নারীর আদর্শ প্রতীক। ত্যাগ এবং তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি।' আর স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা সীতাদেবীকে বলেছিলেন 'ভারতের রানি।'

আরফিনের আপোশহীন কণ্ঠস্বর

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের দেশ আয়তনে বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, সখ-আহ্লাদ সব কিছুতেই কোথায় যেন একতার একটা সূত্র থেকেই যায়। রাষ্ট্রবোধের এই বাস্তব সত্যকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। একই ঘটনা আমরা দেখি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীত যেমন ধ্রুপদী, লোকসঙ্গীত, লঘুসঙ্গীত, নানান রকমের আধুনিক গান আমাদের জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। গানের মধ্য দিয়ে দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ, দিনচর্যা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভালবাসা-বিরহ, ঈশ্বর প্রেম সবই আমরা ব্যক্ত করে থাকি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বর প্রার্থনার একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো সঙ্গীত। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান সব ধর্মেই ঈশ্বর আরাধনায় সঙ্গীতের মূর্ছনার ব্যাপক ব্যবহার হয়ে আসছে। অথচ, অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আজ আমরা যতই একবিংশ শতাব্দীতে থাকি না কেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে যতই উন্নতি করি না কেন, কিছু কট্টরপন্থী মৌলবী এখনও মধ্যযুগেই বাস করছে। এই কট্টরপন্থীরা পূর্বোত্তর অসমের ষোল বছরের কিশোরী গায়িকা নাহিদ আফরিনের বিরুদ্ধে ছেচল্লিশটি ফতোয়া জারি করে তাকে স্টেজে গাইতে নিষেধ করেছে। মৌলবীদের বক্তব্য, নাহিদ আরফিন প্রকাশ্যে গান গেয়ে শরিয়তী কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এদিকে সাহসী, বাহাদুর আফরিন জানিয়েছে যে, সে আমৃত্যু গান গাইতে থাকবে। অসম সরকার তার সম্পূর্ণ সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে।

অসমের ছেচল্লিশটি মৌলবাদী সংগঠন এবং মৌলবীরা আফরিনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে। মধ্য অসমের লজ্জা এবং হোজাই এলাকায় ওই সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে হ্যান্ডবিল বিলি করা হয় এবং তাতে ওই মৌলবীদের সই করা ছিল। এতে লেখা আছে, "জাদু, নাচ, নাটক, থিয়েটার ইত্যাদি শরঈ কানুনের হিসাবে নিষিদ্ধ। সঙ্গীত সমারোহের অনুষ্ঠানও শরঈ-র বিরুদ্ধাচারণ করা হিসেবে মান্য হবে। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"

২০১৫-তে ইন্ডিয়ান আইডল জুনিয়ার অনুষ্ঠানে আফরিন ২০১৬-তে 'আকীরা' সিনেমাতে গান গেয়ে মুম্বইয়ের চিত্রজগতে পদার্পণ করে। মৌলবীদের ফতোয়া জারি করার পরিপ্রেক্ষিতে আফরিন জানিয়েছে যে, সে ফতোয়াকে ভয় পায় না। সে এও জানিয়েছে যে, অনেক মুসলমান গায়ক তাকে পরামর্শ দিয়েছেন, সে যেন কোনো পরিস্থিতিকেই গান গাওয়া বন্ধ না করে। তাই গান গাওয়া সে চালিয়ে যাবে। আপোশহীন কণ্ঠে আফরিনের বক্তব্য, 'আমি একজন গায়িকা এবং সঙ্গীত আমার জীবন। আমি সঙ্গীত ছাড়া বাঁচতে পারব না। আমার এই কণ্ঠস্বর আল্লাহ্ আমাকে গান গাওয়ার জন্য দিয়েছেন। আমায় যদি গান গাইতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমি মারা যাব।'

সঙ্গীতের প্রতি সমর্পিত কিশোরীটিকে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, ধর্মের দোহাই দিয়ে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করাকে কোনো আইন প্রশ্রয় দেয়? যে সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের নাম-গান করা হয়, সেই সঙ্গীত কবে থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলে গণ্য করা হলো? নূরজাহান, বেগম আখতার, সল্‌মা আগার মতো মুসলমান গায়িকারা আমাদের সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। তাঁরা যদি তখন ফতোয়ার ভয়ে গান না গাইতেন, তাহলে কি আমরা তাঁদের সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় কোনো দিনও পেতাম? বর্তমানের প্রসিদ্ধ সুরকার এবং সঙ্গীতশিল্পী রহমানের গানে যে বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য রয়েছে, তা কতজন গায়কের আছে? তাঁর কণ্ঠও রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল কি? বিখ্যাত বাদ্যকার ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, বিস্‌মিল্লা খাঁ, আমজাদ আলি খাঁ— এঁরা কি আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ্ করেছেন? নাকি কেবলমাত্র নারী হবার জন্য আফরিনের বিরুদ্ধে ছেচল্লিশটি ফতোয়া জারি করা হয়েছে? লেখিকা তসলিমা নাসরিন দ্ব্যর্থহীন স্বরে বলেছেন যে, মৌলবীদের ফতোয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের ওপর প্রযোজ্য হয়। আর হবে নাই বা কেন? যে সমাজে মেয়েদের জিনিসপত্রের মতো ব্যবহার করে তালাক চাওয়া হয়; যেখানে নিজের ঘরের নারীদের বোরখায় ঢেকে অন্য ঘরের নারীদের প্রতি কু-দৃষ্টি দেওয়া হয়। সেই সমাজের থেকে আমরা কি-ই বা আশা করতে পারি? তবে সুখের কথা, মাত্র ষোল বছরের কিশোরী আফরিন এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই সে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছে, তার এই সাহস প্রশংসাযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে দেশের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, 'আমি সম্পূর্ণভাবে আফরিনের সঙ্গে আছি। তার গান গাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। ওর উপলব্ধিতে আমি গর্ববোধ করছি।' সুতরাং কিশোরী আফরিন যাতে সঙ্গীত সাধনায় বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে আরও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে সারস্বত সাধনায় আত্মোৎসর্গ করে, ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা জানাই। ■

সঙ্ঘের কাজ রাষ্ট্রবোধ নির্মাণ : মনমোহন বৈদ্য

সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ শ্রী মনমোহন বৈদ্য। ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝে সময় করে পা রেখেছিলেন স্বস্তিকার দপ্তরেও। সাংবাদিক অভিমন্যু গুহ-র সঙ্গে তাঁর আলারচারিতা স্বস্তিকার এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

□ সঙ্ঘ প্রচার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। আপনার কি মনে হয় না, তার জন্য কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট দলগুলো অযথা সুবিধে পেয়ে যায়?

□ সঙ্ঘ আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী নয়। সঙ্ঘের প্রচার বিভাগ কিন্তু সঠিক সময়ই শুরু হয়েছিল। প্রথমে সাংবাদিকতা বিষয়টি কেবল নামেই ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে মাস কমিউনিকেশন অর্থাৎ জনসংযোগ বিষয়টি জুড়লো ১৯৯৩-৯৪ সালে। ঠিক ওই সময়ই কিন্তু সঙ্ঘের প্রচার বিভাগ শুরু হয়। কারণ মাস কমিউনিকেশনের মাধ্যমে মাস অর্থাৎ জনগণের কাছে পৌঁছনোর যে ডাইমেনশন-এর উদ্ভবের ফলে হয়, আমরা কেবল তাকেই গ্রহণ করেছি। অপপ্রচার নিয়েও আমরা মাথা ঘামাই না। কারণ মিডিয়া বায়াস্‌ড। ডাক্তারজী নিয়মিত প্রেস নোট দিতেন। মিডিয়া বেশিরভাগই প্রকাশ করত না। অথচ সঙ্ঘ সম্পর্কে নেহরুজীর সমালোচনা মিডিয়া প্রকাশ করত। কিন্তু গুরুজী যখন নাগপুরে তার জবাব দিলেন মিডিয়া এক লাইনও লিখল না।

□ সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলুন—

□ সঙ্ঘের প্রচার মানে সঙ্ঘের সেবা ভাবনার প্রচার। আর একটা উদ্দেশ্য হলো সঙ্ঘ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ভাবনা রয়েছে তা দূর করা। ২০০৯ সালে যখন আমি প্রচার বিভাগের কাজ শুরু করি তখন অনুভব করেছিলাম সঙ্ঘের সম্পর্কে কোনো কিছু জানে না এমন লোক মিডিয়ায় রয়েছে। কিন্তু এও বুঝেছিলাম যে তারা সঙ্ঘকে বুঝতে চায়। রাষ্ট্রীয় বিচারধারার প্রসার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা প্রতি বছর স্তম্ভলেখকদের সেমিনার আয়োজন করি। তাঁদের রাষ্ট্রীয় বিচারধারা সম্বন্ধে অবহিত করানোই আমাদের লক্ষ্য।

□ এত নেগেটিভ প্রচারের ফলে সঙ্ঘের সাংগঠনিক ভিত দুর্বল হয়নি?

□ না। আসলে সঙ্ঘের নাম বড়ো হোক এটা সঙ্ঘ কোনোদিন চায়নি। সঙ্ঘে ভারতমাতার চর্চাই প্রথম ও শেষ কথা। সঙ্ঘের কাজ সমাজের জাগরণ। জনতাকে জাগ্রত করা ও সমাজের ভিত শক্ত করাই আমাদের কাজ। জাগ্রত মানুষ তথা সাংবাদিকদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আর এস এসের উদ্দেশ্য সবার মধ্যে রাষ্ট্রীয় বোধের বিকাশ এবং দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করব এই মানসিকতা গড়ে তোলা। সঙ্ঘ শুধু সমাজকে গঠন করবে। বাকি কাজের দায়িত্ব তো সমাজের।

□ আজকাল জেএনইউ বা যাদবপুরে নকশালপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো যে দেশবিরোধী কাজকর্ম করছে সে সম্পর্কে কী বলবেন?

□ একটা কথাই বলব। কমিউনিস্টরা বা নকশালেরা শুধু মিডিয়ার আছে। আমরা আছি ময়দানে। কমিউনিস্টদের পক্ষে আদর্শগত লড়াইটা দিনকে দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। ওরা নিজেদের জমি হারাচ্ছে। ওদের এই আক্রমণাত্মক ভাবটা সেই জন্যই। ভারতে রাষ্ট্রীয় বিচারধারাকে গ্রহণ করার প্রবণতাই বাড়ছে। ভারতবর্ষের নীতিতেই এগিয়ে যেতে হবে। এটা আত্মগৌরবের জন্যও যেমন, তেমন বিশ্বের কল্যাণের জন্যও প্রয়োজন। এই পবিত্র ভূমিকা পালনের জন্য ভারতকে তৈরি করতে হবে। এটাই আমাদের কাজ।

□ একটু আগে আপনি মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচারের কথা বললেন। সঙ্ঘ এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করছে?

□ সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রচার বিভাগের আর একটি উদ্দেশ্য। যাতে তারা মিডিয়ার সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারে। মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারে। সঙ্ঘের প্রচার করার দরকার নেই। সমস্যা হলো, এদেশের মানুষের কাছে ভারতীয়ত্বের

ধারণাটি স্পষ্ট নয়। অনেক বছর কেটে গেছে। এখন আর আমরা তার জন্য ব্রিটিশদের দোষ দিতে পারি না। একজন কার্যকর্তার কাজ সাধারণ মানুষের কাছে ভারতীয়ত্বের ধারণা স্পষ্ট করে তোলা। দায়িত্ব নিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম সঙ্ঘ আর মিডিয়ার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সঙ্ঘের কোনো মুখপত্র নেই।

■ **সঙ্ঘের প্রচারবিভাগ কি সব রাজ্যে একইরকম সক্রিয়?**

■ অবশ্যই। প্রতিটি রাজ্যে প্রচারবিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে। আমরা শুধু প্রশিক্ষণ দিই। মিডিয়ায় যাঁরা আছেন তাদের সঙ্ঘ সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা আছে। আমাদের কার্যকর্তারা যাতে আরও ভালোভাবে মিডিয়াকে হ্যান্ডল করতে পারে তার জন্য আমরা বিশেষ প্রশিক্ষণ দিই। শেখাই কীভাবে প্রেস নোট লিখতে হয়। মিডিয়া যাতে আমাদের প্রতিটি জাতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তার জন্য আমরা চেষ্টা করি। মিডিয়া যাতে সঙ্ঘের আদর্শ ঠিকমতো বুঝতে পারে তার জন্য প্রতিটি রাজ্যে আমাদের প্রচার বিভাগ চেষ্টা করছে। প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সিটিজেনশিপ রিপোর্টার করে তোলা আমাদের লক্ষ্য। কীভাবে কাগজের সম্পাদককে চিঠি লিখতে হবে বা চিত্রসাংবাদিকতার একেবারে গোড়ার কথা--- সবই তাদের শেখানো হচ্ছে। জেলায়- জেলায় আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি এই প্রশিক্ষণ। এছাড়া, যাঁরা খবরের কাগজে নিয়মিত কলাম লেখেন, আমরা সঙ্ঘ-সংক্রান্ত পুস্তক ও পত্রপত্রিকা তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। উদ্দেশ্য ওই একই, সঙ্ঘের আদর্শকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরা।

■ **সম্প্রতি ইন্দোরে একটা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির ফেস্টিভ্যাল হয়ে গেল। উদ্যোক্তা ছিল চিত্রভারতী—**

■ হ্যাঁ, চিত্রভারতী সঙ্ঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত। স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি এখন একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। সঙ্ঘের কাজ রাষ্ট্রবোধের নির্মাণ। তারই এক-একটি ধাপ ছবিগুলিতে ফুটে উঠেছে।

■ **মিডিয়া অনেক সময় জাতীয়তাবিরোধী কাজের সমালোচনার নামে তাতে ইন্ধন জোগায়। এ ব্যাপারে কী বলবেন?**

■ সেরকম কিছু হলে পাঠককে এগিয়ে আসতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া যেহেতু ব্যক্তির হাতে থাকে তাই সেখানে প্রতিক্রিয়া সরাসরি আসে। সংবাদপত্রে সে সুযোগ নেই। সুতরাং সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেশবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দায়িত্ব পাঠককে নিতে হবে। ■

বেঙ্গল
সামুই
ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই

ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সুন্দরবনের সোনা ফলানো মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাটির বাড়ির উঠোনে বসে ঋতা কামিলা যখন সমবায় চাষ, জৈব খাবার বা বায়োগ্যাস নিয়ে কথা বলেন তখন তার চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি ফুটে ওঠে। বোঝা যায় মুখস্থবিদ্যা নয়, এ তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। ঋতার ঠিকানা রামোহান গ্রাম। থানা পাথরপ্রতিমা। এক কথায়, সুন্দরবন। ঋতার পরিচয়, তিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক। পাঁচ বছর ধরে সাড়ে চার বিঘে জমিতে সোনা ফলাচ্ছেন। পাশাপাশি চলছে মুরগি ও মাছ চাষ এবং গবাদি পশুপালন।

সমবায় চাষ যে শুধু চাষাবাদের চিরাচরিত ধারণাইটাই পাল্টেছে তাই নয়, খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জীবনজীবিকার নতুন-নতুন ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছে। সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে এখনও ঋতার হাড় হিম হয়ে যায় যখন তিনি মূলত ধান চাষ করতেন। সঙ্গে সামান্য কিছু শাকসবজি। প্রায় প্রত্যেক বছর গোবাড়িয়া নদীর বন্যায় নষ্ট হতো ফসল। যা শাকসবজি হোত তাতে চারজনের সংসার চলত না। ঋতার স্বামী দেবাশিস বাধ্য হয়ে ভ্যানরিকশা চালাতেন।

২০০৮ সালে ঋতা ১২ সদস্যের সেল্ফ হেল্প গ্রুপ শান্তি মহিলা দলে যোগ দিলেন। এখানেই মিলল সমবায় চাষের প্রশিক্ষণ। এরিয়া রিসোর্স ট্রেনিং সেন্টারের দেওয়া এই প্রশিক্ষণ আসলে ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সারভিস সেন্টারের কর্মসূচির অঙ্গ। ঋতা বলেন, ‘সেই প্রথম আমি সমবায়চাষের বিভিন্ন দিকের কথা জানতে পারলাম। জমি প্রক্রিয়াকরণের কথাও আগে কখনও শুনিনি। তবে এ ব্যাপারে আমি গোড়ায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। ভয় হোত, যদি জমির কোনো ক্ষতি হয়! কিন্তু প্রশিক্ষণের পর আমার সব দ্বিধা কেটে গেল। ভাবলাম একটা চান্স নিয়ে দেখিই না!’

ঋতার জমিতে দুটি পুকুর আছে। সরু খালের সাহায্যে পুকুরদুটি জুড়ে সেই খালের জলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা। বন্যার সময় খালটি নিকাশীর কাজও করে। উপরন্তু বন্যার জলবাহিত পলিমাটি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পুকুরের পাশেই মুরগি রাখার জায়গা। মুরগির মল মিশে যাচ্ছে মাটিতে, পুকুরের জলে। ঋতা বলেন, ‘এতে মাছেরা খুব দ্রুত বাড়ে। ট্রেনিং-এ আমাদের শেখানো হয়েছিল যে-কোনো রাসায়নিক সারের থেকে গোবরসার চাষের পক্ষে বেশি উপকারী। আমার দুটো গোরু। তারা যা গোবর দেয় তাতে আমার সার হয়।’

এখন ঋতা বছরে দু’বার ধান চাষ করেন। শাকসবজি অন্তত তিনবার। ঋতা বলেন, ‘এখন আমাদের বাড়িতে বাজারের কিছু ঢোকে না। চাল, শাকসবজি মাছ ডিম মাংস (মুরগি) দুধ সবই বাড়ির। সংসার চালাবার পরেও বোরো ধান বিক্রি করে বারো থেকে চোদ্দ হাজার টাকা আয় হয়। শাকসবজি বিক্রি করেও কিছু আসে।’

সমবায় চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার উদাহরণ ঋতা অবশ্য একা নন। ৩৭ বছরের গৌরী মণ্ডল আরেকজন। তার পালিত হাঁস-মুরগির সংখ্যা ৪০টি। রয়েছে তিনটি গোরু এবং চার বিঘা জমি জুড়ে সমবায় চাষের ফার্ম। তিনি বলেন, ‘দুধ আর ডিম বিক্রি করে আমার রোজগার ভালোই। আমার স্বামী বাইরে থাকে। কিন্তু আমি যা রোজগার করি তাতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না।’

কিছুদিন আগেও একটা ধারণা ছিল সুন্দরবন মানেই অভাব। আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেকখানি পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষের মুখ।

কিন্তু এখনকার সুন্দরবন সেরকম নয়। ঋতা-গৌরীদের শক্ত হাত সুন্দরবনের লবণাক্ত জমিতে লাবণ্য এনে দিয়েছে। ■

শুভ নববর্ষ

পয়লা বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ। বাংলা নতুন বছর শুরু। এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলা সালের হিসেব রাখা কিংবা বাংলা ক্যালেন্ডার মিলিয়ে চলা প্রায় হয় না বললেই চলে। কিন্তু তবুও নববর্ষ হিসেবে পয়লা বৈশাখ বাঙালি জীবনের একটি সাংস্কৃতিক অঙ্গ। এক সময় ছিল যখন প্রতিটি বাঙালি বাড়িতে শোভা পেত লক্ষ্মী গণেশ ও নানা দেবদেবীর ছবি সম্বলিত বাংলা ক্যালেন্ডার। কারণ তখন বাড়ির মায়েরা প্রতিদিন ওই ক্যালেন্ডার দেখেই তিথি অনুযায়ী ঠিক করতো বাড়িতে কোন দিন কী রান্না হবে। এখন আর সেসব দিন নেই। আমরা অনেকে ভুলেই যাই এখন বাংলা ক্যালেন্ডারে কত তারিখ চলছে। তবে এতো পরিবর্তনেও কিন্তু পাল্টায়নি বাঙালির নববর্ষ উদযাপন। পয়লা বৈশাখের দিন বাড়িতে পুজো করে, নতুন বস্ত্র পরিধান করে বাঙালি এখনও সারাবছর সুন্দরভাবে কাটাবার সংকল্প গ্রহণ করে । আত্মীয় পরিজনকে আমন্ত্রণ করে রকমারি পদ সহকারে হয় খাওয়া-দাওয়া। কোথাও কোথাও আয়োজন করা হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের। নৃত্যগীতের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয় নতুন বছরকে। ব্যবসায়ীরা এই দিনে করেন হালখাতা অর্থাৎ হিসেব নিকেশ করার নতুন

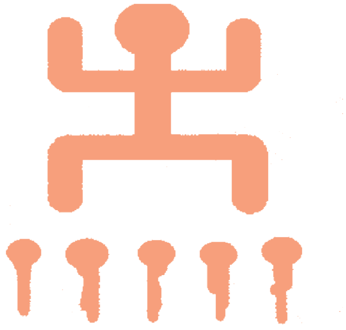

খাতার পুজো। ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে যতই হইহুল্লোড় মাতামাতি হোক না কেন, সেখানে কিন্তু বাংলা নবর্ষের মতো আপনত্বের ছোঁয়া থাকে না। পয়লা বৈশাখে যদি নতুন জামা না হয় তাহলে মনটা যেন কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আপামর বাঙালির কাছে প্রতিবছর এমন করেই আসে বাংলা নববর্ষ। আমরা চেষ্টা করি এই দিনটি যাতে সুন্দর ভাবে কাটে। কারণ, আমাদের অনেকের মনের ভেতরে একটি ধারণা কাজ করে যে বছরের প্রথম দিন যেমন কাটবে সারাবছর তেমনি কাটবে।

বছরের পর বছর ধরে বাঙালির কাছে বাংলা নববর্ষ প্রায় একই আঙ্গিকে ধরা দিয়ে আসছে। এবং একইভাবে তা উদযাপনও হয়ে আসছে। কিন্তু এর সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বঙ্গাব্দের শুরু কবে থেকে? কেই-বা শুরু করেছেন? বঙ্গাব্দ হলো বাঙালিদের বছর গণনার মাধ্যম বা ক্যালেন্ডার এবং বাঙালিরাই এর সুচনা করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই মনে হয়, আসল ঘটনাও তাই। রাজা শশাঙ্ক এই বঙ্গাব্দের সূচনা করেন। কিন্তু কিছু মানুষ অকারণে একে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা নানাভাবে বলার চেষ্টা করছেন যে শশাঙ্ক বঙ্গাব্দ শুরু করেননি, শুরু করেছেন আকবর। যা একেবারেই ভুল। ৫৯৩ সালে গৌড়ের রাজা হন শশাঙ্ক। সেই উপলক্ষ্যে একটি নতুন বছরের প্রবর্তন করেন, সেটি হলো বঙ্গাব্দ।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, গণিতাচার্য ও পঞ্জিকাবিদ নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী সবাই মনে করেন যে বঙ্গাব্দের প্রবর্তন করেছেন রাজা শশাঙ্ক। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বেশিরভাগ হিসেব নিকেশ হলেও আমাদের পুজো পার্বণ, ব্রত, বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য শুভ কাজ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়। সেখানে তিথি নক্ষত্র দেখা হয়।

আমাদের দেশে বছর গণনার এই পরম্পরা অনেক প্রাচীন। বঙ্গাব্দ ছাড়াও যুগাব্দ, বিক্রম সংবৎ, শকাব্দ আরও নানা অব্দ আছে। আমাদের দেশে রাজারা তাদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নতুন নতুন অব্দের প্রবর্তন করেছেন। যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা চালু করেছেন মল্লাব্দ, কোচবিহার রাজ বিশ্বসিংহ চালু করেছেন বিশ্বসিংহশক, লক্ষ্মণ সেন চালু করেন লক্ষ্মণাব্দ।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

দাদরা ও নগর হাভেলি

পশ্চিম ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি। এক সময় পোর্তুগিজদের উপনিবেশ ছিল। এই অঞ্চল মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করছে। দাদরা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নগর হাভেলি। আরবসাগর ও গুজরাটের পশ্চিম উপকূল থেকে এই অঞ্চল দুটি খুব দূরে নয়। দাদরা ও নগর হাভেলি এক সময় মারাঠা রাজত্বের অংশ ছিল। ৭২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল এই অঞ্চল। স্বাধীনতার পর ১৯৫৪ সালের ২ অক্টোবর এখানে পোর্তুগিজ শাসনের অবসান হয়। তারপর ১৯৬১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভারতের সঙ্গে যোগদান করে। দাদরা ও নগর হাভেলির আয়তন ৪৯১ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৩,৪২,৮৫৩ জন। এই অঞ্চলের প্রধান তিনটি ভাষা হিন্দি, গুজরাটি ও মারাঠি।

এসো সংস্কৃত শিখি

एवमेव आगतवान्।

এমনি এসেছিলাম।

विना कारणं किमर्थ गन्तव्यम्?

বিনা কারণে কী জন্য যাওয়া?

भवत: वचनं सत्यम्।

আপনার কথা সত্য।

मम वचनं क: शृणोति?

আমার কথা কে শুনছে?

तदा किमपि न स्फुरितम्।

তখন কিছুই মনে পড়েনি।

ভালো কথা

ভালো মানুষ খারাপ মানুষ

আমরা প্রায়ই বলে থাকি এই মানুষটি ভালো কিংবা ওই মানুষটি খারাপ। আমাদের মধ্যে সাময়িক কোনো ঘটনার মাধ্যমে আমরা ঠিক করে নিই যে কেউ খারাপ বা কেউ ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। কারণ একটি মানুষ আমার কাছে খারাপ হলেও অন্যের কাছে সে ভালো হতে পারে। হয়তো আমার সঙ্গে তার কোনো খারাপ হয়েছে, কিন্তু সে হয়তো অন্য কারোও উপকার করছে। যাকে উপকার করেছে সেই মানুষটির কাছে সে ভালো। সব মানুষেরই নিজের পছন্দ অপছন্দ থাকে, সেই অনুযায়ী তার বন্ধুত্ব হয়। কোনো ব্যক্তি আমার বন্ধু না হলেও তার কোনো না কোনো বন্ধু আছে। সেই বন্ধুর কাছে সে ভালো মানুষ। তাই সাময়িক কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে কোনো মানুষকে খারাপ বলা উচিত নয় এবং সে খারাপ এই ভেবে তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা উচিত নয়।

অন্বেষা হাজরা, বরানগর, কলকাতা-৩৬

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) জ গ ন রা ভা

(২) অ ন্দ নি র সু

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) প দ ষ উ নি

(২) র্য তা গ চা ণি

২৭ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) পশ্চাৎপট (২) তারামণ্ডল/লতামণ্ডপ

২৭ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) অকৃত্রিম (২) হরিদ্রাভ

উত্তরদাতার নাম

(১) প্রীতম মণ্ডল, সিউড়ী, বীরভূম (২) কুন্তল ভৌমিক, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা (৩) দীপ কর্মকার, মাণিকতলা, কলকাতা (৪) দীপান্বিতা রায়, শামুকতলা, জলপাইগুড়ি

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শব্দরূপ-৮৩০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

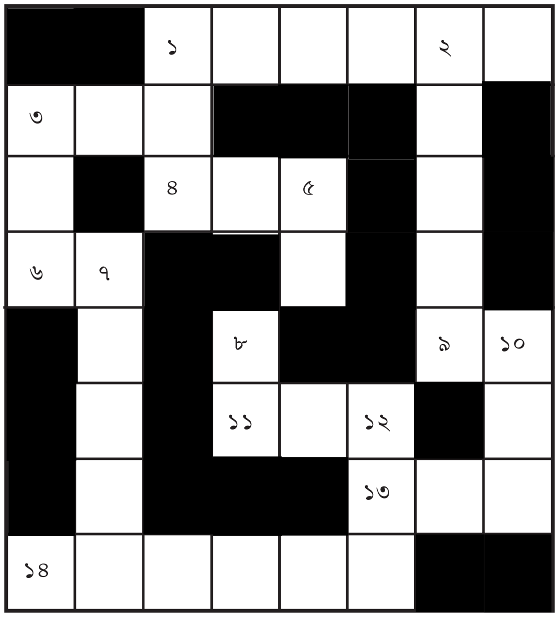

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** রাবণবধের জন্য রামচন্দ্রের দ্বারা অসময়ে দেবীর বোধন, **৩.** পৌরাণিক রাজা বিশেষ যিনি ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গ হতে নিক্ষিপ্ত হলে বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় শূন্যে স্থাপিত হয়েছিলেন, **৪.** শজারু, **৬.** প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি, **৯.** 'তুমি---নীরবে, হৃদয়ে মম', **১১.** কৃষ্ণসহচর গোপবালক, **১৩.** চতুর্থ পাণ্ডব, **১৪.** কপট সাধু।

উপর-নীচ : **১.** হস্তিতাড়নের লৌহদণ্ড, ডাঙ্গস, **২.** আক্ষেপ রোগ, খিঁচুনি, টিটেনাস, **৩.** তিন ধারা বিশিষ্ট; গঙ্গা (স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী), **৫.** শুকপাখি, **৭.** একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, মাঝারি মাপের ঢাক, **৮.** অষ্ট গণদেবতা যাঁরা শান্তনু-গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মেছিলেন, **১০.** মৃত-দেহাশ্রয়ী প্রেত, **১২.** প্রশস্তচিত্ত, উদারপ্রাণ।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৭
সঠিক উত্তরদাতা

নিমাই চৌধুরী
রাজনগর, মালদা
সঞ্জয় সরদার
দক্ষিণ বারাসাত
দ: ২৪ পরগনা

অ	ন্ত্য	জ	■	অ	পো	গ	ণ্ড
স্ব	■	বা	মা	ঙ্গ	■	■	■
■	জ	লা	■	না	গ	পা	শ
■	য়	■	■	■	■	দো	■
■	দে	■	■	■	■	দ	■
অ	ব	তা	র	■	য	ক	■
■	■	■	বা	স	ব	■	
র	ন্তি	দে	ব	■	ন	গ্নি	কা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৮৩০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৮ মে ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ২৯

১৯১৮ সালে আশ্রয়দাতা আইজো সোমার মেয়ে তোসিকো সোমাকে রাসবিহারী বিবাহ করলেন। পৌরোহিত্য করলেন ড: তোমায়া।

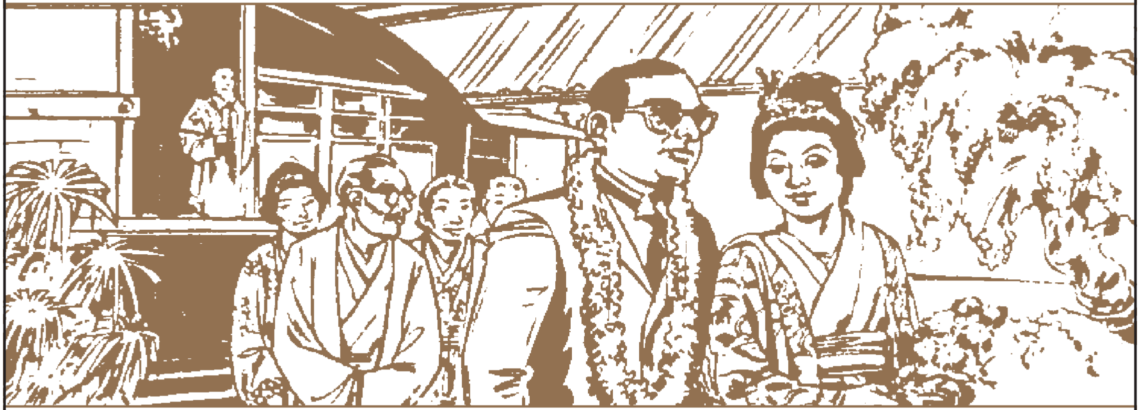

এই বিবাহিত জীবনে পুলিশের ঝামেলা লেগেই ছিল। তাই কয়েক সপ্তাহ অন্তর বাড়ি বদলাতে হত।

ক্রমশঃ

With Best Compliments from :-

A Well Wisher

(P. N. Choudhury)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

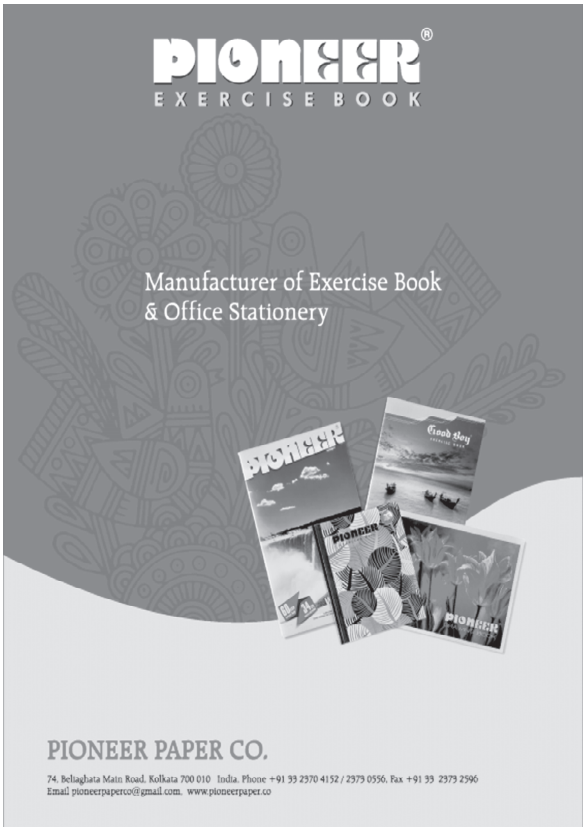

"সনাতন ধর্মে যে মহান ঐশ্বর্য আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল, রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহাজীবনে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখে আমরা হিন্দুরা অকস্মাৎ সে বিষয়ে সচেতন হয়েছি।
অতএব আমাদের এখন অপরূপ সরলভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সেই আদর্শ কি, যদি প্রশ্ন করি, তবে বলা যায়— আমরা কি আমাদের সম্মুখে (এ বিষয়ে) দুটি দৃষ্টান্ত পাইনি যাঁদের জীবনে এই আদর্শ মূর্ত হয়েছে এবং যাঁদের পদচিহ্ন আমরা অনুসরণ করতে পারি?"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
10 April - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।